৪১বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আহরণ	সুন্দরলাল বহুগুণা	২
কাণ্ডজ্ঞান	আশীষ লাহিড়ী	৭
করোনা মাতা	নন্দিনী সি সেন	১১
বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি	রূপক বর্ধন রায়	১৪
স্বচিকিৎসা	গৌতম মিস্ত্রি	১৭
হাতে কলমে চেষ্টা	ভূপতি চক্রবর্তী	২০
পরীক্ষার কাল	নন্দিনী ব্যানার্জী	২৩
উন্নয়ন ও পরিবেশ	নন্দগোপাল পাত্র	২৪
উনিশে মে ১৯৬১	মৃদুল ঘোষ	২৬
বৈজ্ঞানিক মেজাজ	শ্যামল ভদ্র	২৮
প্রতিবেদন: শিক্ষায়তনে 'জ্যোতিষশাস্ত্র'		২৯
সংগঠন সংবাদ		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস - ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com/ফেসবুক:http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

দীর্ঘ দেড় বছরের অধিক সময় ধরে অতিমারী মানব সমাজকে ভীত সন্ত্রস্ত ও প্রায় ঘরে বন্দী করে রেখেছে, নিকটদূরে এই জটিল ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আশার কথা ভ্যাকসিনের প্রয়োগ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণকে কিছুটা স্তিমিত করতে পেরেছে, তবে বিপদ এখনও কাটেনি। তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায় দিন গুনছে মানুষ। ভ্যাকসিন নেওয়া না-নেওয়ার ভেতর যে বিস্তর ফারাক তা বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা প্রতিনিয়ত সতর্ক করছেন। অনেক রাজ্যে স্কুল কলেজ খুলতে শুরু করেছে, আমাদের রাজ্যেও আশা করা যায় শারদোৎসবের পর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। ছাত্রছাত্রীদের কলতানে শিক্ষাপ্রাঙ্গনগুলি আবারও প্রাণ ফিরে পাবে।

এই সঙ্কটকালে এবছরের শুরুতে আমরা দেখেছি তথাকথিত সভ্যদেশের পার্লামেন্টে উন্মত্ত মানুষের আক্রমণ। দেশ হেরে যাওয়ার দায় চাপিয়ে দেওয়া হল সেই সব খেলোয়াড়দের ঘাড়ে যাদের গায়ের রঙ কালো। সম্প্রতি আফগানিস্থানে কুড়ি বছর পরে আবারও 'গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এলো', চালু করল মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অনুশাসন যেখানে নারী স্বাধীনতা ভুলুণ্ঠিত। আমাদের দেশে জেলখানার ভিতরে অশীতিপর ফাদার স্ট্যান স্বামীর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুতে সচেতন মানুষ অসহায় ও নির্বাক, প্রতিবাদ-আন্দোলন শাসকের দুয়ারে অযথাই মাথা কুটে মরছে।

পরিবেশ নিয়ে হাড় হিম করা সতর্কবার্তা দিচ্ছেন পরিবেশবিদরা। সাধারণ মানুষ ভাবছেন এসব তো বিজ্ঞানীরা সামলাবেন। এ নিয়ে ভারি সুন্দর বার্তা দিলেন এক পরিবেশবিজ্ঞানী। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল হিমালয় ও অ্যান্টার্কটিকায় হিমবাহ গলে গেলে আমাদের কী করণীয়? উত্তর এল— সকালে দাঁত ব্রাশ করার সময় বেসিনের কলটা বন্ধ রাখবেন। 'আরণ্যক'-এ বিভূতিভূষণ বলছেন, 'মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর দেশে যেখানে পতিতপক্ক জম্বফুলের গন্ধে গোদাবরী-তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে।' বন কেটে বসতি স্থাপন আজ আর নতুন কোনো বার্তা বয়ে আনে না। এ যেন স্বাভাবিক। পরিবেশ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সুন্দরলাল বহুগুণা হিমালয়কে বাঁচাতে আমৃত্যু লড়াই করে গেলেন। এই সংখ্যায় তাঁর একটি অমূল্য লেখা থাকছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নানান

অনুষ্ঠান হয়ে গেল। আবার রাজস্থান বিধানসভায় বাল্য বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেল। নাবালক ও নাবালিকাদের হয়ে বেশ কিছু সংগঠন তা নিয়ে প্রতিবাদ মুখর। বেশিদিনের কথা নয়, গণেশের দুধ খাওয়া নিয়ে বেশ হাসাহাসি হয়েছিল। ঘটনা হল সেই দলটার থেকে গণেশ ভক্তদের সংখ্যা বহুগুণ বেশি ছিল। এ রাজ্যে পুজোর ক্যালেন্ডারে গণেশ বাবাজি ঢুকে পড়েছেন। এত প্রচার, সচেতনতা শিবির করেও সাপে কাটা মানুষকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বদলে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদিও তা কমেছে, তবে একেবারে বন্ধ হয়নি। বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে মানবসভ্যতা এগিয়ে চলে। কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে দেখছি দেশ জুড়ে নানান অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা দিয়ে মানুষকে বেঁধে রাখার চেষ্টা চলছে। যুক্তিহীনতাকে সরাসরি চোখে চোখ রেখে চ্যালেঞ্জ না জানালে সে আমাদের অবশ করে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। যে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে পারতেন দাভোলকারের মতো মানুষরা। সম্প্রতি বিজ্ঞানী ও কিছু বিজ্ঞান সংগঠন এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে, এই সংখ্যায় তারই প্রতিবেদন থাকছে।

২০২১-এ বইমেলা হয় নি। পাঠকের মুখোমুখি হবার সুযোগ হারালাম। ২০২২-এ বইমেলা হলে আগের মতোই আমাদের স্টল থাকবে। পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকা ও আমাদের প্রকাশনার বই বিক্রির জন্য আমরা হকারবন্ধুদের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। তাঁরাও ভাল নেই। সারাদিন স্টল খুলে বসে থাকলেও ক্রেতার দেখা মেলে না।

উৎস মানুষ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ নভেম্বর ২০০৮-এ প্রয়াত হন। ২০০৯ থেকে প্রতি বছর তাঁর প্রয়াণ মাসে উৎস মানুষ 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করে আসছিল। তাতেও ছেদ পড়ল, ২০২০-তে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা যায়নি। এবারেও করা গেল না। স্মারক বক্তৃতা ভার্চুয়ালি করার প্রস্তাব এসেছিল। যার সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে আমরা আর এগোই নি।

উৎসবের আতিশয্যে অতিমারীর বিপদকে হালকাভাবে নিলে বিপর্যয় বুকের ওপর চেপে বসবে। একথাটা আমরা যেন না ভুলি।

— সম্পাদকমণ্ডলী

উমা

আহরণ

হিমালয়ের আর্তনাদ

সুন্দরলাল বহুগুণা

দিল্লীর সব রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে গত এপ্রিল মাসে সাধারণ নির্বাচনের জন্য তাদের নীতি নির্দ্ধারণে ব্যস্ত হয়। এই সুযোগ বা উপলক্ষে আমি চৌদ্দটি স্বনামখ্যাত দলপতিদের একটা চিঠি লিখি, ভাগীরথী নদীর কূলে অবস্থিত আমার পাহাড়িয়া গ্রামে বসে। আমি তাতে লিখি যে, জনশিক্ষার একটি বৃহত্তম সমারোহ বোধহয় সাধারণ নির্বাচন। আজ হিমালয় মরতে বসেছে, হিমালয়ের এই নৈঃসর্গিক মৃত্যু আমাদের দেশ ও আমাদের দেশের নিকটবর্তী অন্যান্য দেশের আর্থ সামাজিক জীবনে গভীর সংকট এনে দেবে। অতএব আমি মনে করি যে হিমালয় সম্বন্ধে একটা সুস্থ নীতি তৈরী করা ও গ্রহণ করাটা আজকের দিনে সব দলেই অগ্রাধিকার পেতে পারে। এই পত্রের সঙ্গে হিমালয় সম্বন্ধে আমার সারাজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁদের কাছে একটা জরুরী কর্মধারা রচনা করে পাঠাই। এবং তার সঙ্গে ইয়োরোপের আল্পস্ পর্বতমালা সংরক্ষণ সম্বন্ধে যুক্ত জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের মতামত পাঠিয়ে দিই।

আজ পর্যন্ত (১৯ এপ্রিল) আসন্ন নির্বাচনে হিমালয় সম্বন্ধে কোন দল বা কোন নেতার কোন মতামত প্রকাশিত হয়নি। আমার পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারও করেননি, কেবলমাত্র জন দুই ব্যক্তির কাছ থেকে সাড়া পাই— এবং তারা দেশের কেউকেটা নেতা নন। আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক নেতারা কখনও তাঁদের কাছে লেখা কারো পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারই করেন না। দেখা করতে চাইলেও কোন উত্তরই পাওয়া যায় না। জনসাধারণকে এ জাতীয় উপেক্ষা করে চলার অনিবার্য ফল হয়, নেতারা প্রত্যেকে তাদের চারিদিকে পার্শ্বচর ঘেরা এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ হ'য়ে চলাফেরা করেন। এই পার্শ্বচর পারিষদের উপদেশ শুনেই এইসব জনসংযোগবিহীন নেতারা রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি নির্ধারণ করে থাকেন। অথচ এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে অতীতে ইতিহাসে বিখ্যাত স্বৈরাচারী রাজারাও জনমতটা কী তা বোঝবার জন্য ছদ্মবেশে প্রজাদের মধ্যে তাদের মতামত শুনবার জন্য মাঝে মাঝে ঘুরতেন। জনসংযোগই গণতন্ত্রের জীবনীশক্তির অক্সিজেন বায়ু। উচ্চমঞ্চ থেকে ভাষণদার নেতাদের সঙ্গে আজকাল জনসাধারণের কোন আত্মিক যোগসূত্র নেই। তাতে অবশ্য বক্তার বিশেষ কোন আক্ষেপ থাকে না, কেননা বক্তা তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরেই মুগ্ধ হয়ে থাকেন।

আজকের রাজনৈতিক আকাশে 'মণ্ডল' এবং কমণ্ডল, রাম ও রুটি, বেকারী ও স্থায়ী সরকার ইত্যাদি যেসব আওয়াজ শোনা যায় বা ওঠানো হয়েছে, তাতে দেশের অথবা পৃথিবীর প্রকৃত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে দলপতিদের নীতি কিছুই প্রকাশ পায় না, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়েও কোন ভাবনা চিন্তা প্রকাশ পায় না। উপসাগরীয় যুদ্ধ দেশের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন উপস্থিত করেছে, যেমন, ছোট ছোট দেশগুলি তাদের দুর্বল অস্ত্রশক্তি দিয়ে কীভাবে আজকের দিনের অতি আধুনিক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের মোকাবিলা করবে, তারা কি বৃহৎ শক্তিমান দেশগুলির পক্ষপুটে আশ্রয় খুঁজতে যাবে অথবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে নতুন ক'রে বন্ধুত্ব সৃষ্টির পথ নেবে ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন করতে অগ্রসর হবে মূলত এই বিষয়গুলি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বৈদেশিক মুদ্রা নির্ভর ব্যবস্থাপনার বদলে প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্য কোন পরস্পর নির্ভরশীল আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা বেশি নির্ভরযোগ্য হবে--- এসব প্রশ্নও উপস্থাপিত হয়েছে। হিমালয় সম্বন্ধে আমাদের এমন কোন নীতি নেওয়া দরকার যাতে হিমালয়ের মাধ্যমে অথবা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ— যথা পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, চীন ও বাংলাদেশ–– এদের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। হিমালয় বোধহয় আজ আমাদের সকলকে মেলাতে পারে— হিমালয় আজকের এই বৈরীভাবাপন্ন দেশগুলির মধ্যে একটা মিলন ক্ষেত্র উপস্থিত করতে পারে।

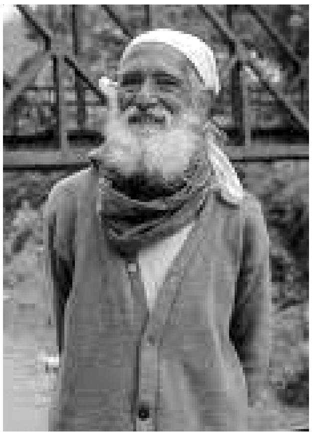

হিমালয়ে চারটি সংস্কৃতির ধারা এসে মিশছে। উত্তরে হিমবাহ এভারেস্ট পর্বতমালার পাদদেশ থেকে লামা-সভ্যতা প্রসার, মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় হিন্দুকুশ গিরিবর্ত্ম দিয়ে ঐশ্লামিক সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় আর্য সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতে মিশ্রিত থেকে ভুটান পর্যন্ত যার প্রসারিত রূপরেখা বর্তমান, ভারত চীন ও ভারত বর্মা সভ্যতার নানাবিধ ঘাত প্রতিঘাতে আরণ্যক সভ্যতার সঙ্গে অরুণাচলের বিস্তৃত এলাকাতে আরণ্যক ও অদিবাসী সভ্যতার মিশ্রণ— এই বিভিন্ন সভ্যতার সঙ্গমস্থলের বিরাট পটভূমিকা সৃষ্টি করে রেখেছে এই হিমালয়। বিভিন্ন সভ্যতার ধারাকে যুক্ত করেছে হিমালয়েরই মনুষ্য সন্তানদের সাহসিকতা ও সৃষ্টিশীলতা এবং কঠোর পরিশ্রম।

এই হিমালয়কে একদা মনে হত এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। ভগবদ্‌গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর যাবতীয় পর্বত মধ্যে হিমালয়কেই তাঁর দৃঢ়তার স্বরূপ বলে বর্ণনা দিয়েছেন, এই হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে চঞ্চল, ভঙ্গুর একটা এলাকা। এই বিস্তৃত এলাকায় প্রায় সর্বত্রই নানা ধরনের রাজনৈতিক সংকট, সংঘর্ষ বরাবরই লেগেছিল বা আছে। তা সেই আফগান-পাক সীমান্তেই হোক, ভারত-পাক সীমান্তেই হোক, ভারত-চীন বরাবরই হোক, অথবা ভারত-বর্মা সীমান্তেই হোক। নানা ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থানপতনের ইতিহাসে এই হিমালয় সমৃদ্ধ। এই হিমালয়ের গুহাগহ্বরে— একদা যেখানে সাধু সন্ন্যাসীরা যাগ-তপ করতেন, সেখানে আজ ঘাঁটি বেঁধে বসে আছে বিভিন্ন রাজ্যের সৈন্য-সামন্তরা— তাদের নিজ নিজ দেশের অতন্দ্র পাহারাদার হিসেবে। এই পার্বত্য অঞ্চলে সীমান্ত পাহারার খরচ অন্যান্য প্রান্ত এলাকার সীমানারক্ষার চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়সাধ্য। স্বাভাবিক অবস্থায়— যখন যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে না— তখনও এই পার্বত্য এলাকার সৈন্য সামন্ত রাখার খরচ, সমতল এলাকার ঘাঁটি রক্ষার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

হিমালয়ের যেসব এলাকাতে আগে মনুষ্য বসতি ছিল না, বা বিরল ছিল, সেসব এলাকাতে শরণার্থীদের আজকাল বসাতে গিয়ে বিপুল খরচ তো হচ্ছেই, উপরন্তু সেই সব এলাকার স্বাভাবিক পরিস্থিতির পরিবেশেও বিকৃতি ঘটে গেছে। যেমন পাক-হিমালয় এলাকাতে আফগান শরণার্থীদের হিমালয় ও নেপালে বসাতে হয়েছে— এসব নব নব বসতির ফলে হিমালয় স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপন্ন হয়ে পড়েছে। হিমালয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ এই সব নব নব বসতির ফলে ও উৎপাতে আজ তার ভারসাম্যে প্রচণ্ড আঘাত পড়ছে। পাকিস্তানের হিমালয়ে ১৯৪৭ সাল থেকেই শরণার্থী বসতি করা হয়েছে— বিস্তৃত বনাঞ্চল ভেঙেচুরে দিয়ে। পরে আফগানিস্তান থেকে শরণাগতদের এই হিমালয়ের এই আদি বনাঞ্চলেই বন কেটে বসানো হয়েছে। ভারতেও সুদূর হিমাচল প্রদেশের মধ্যে ও

নেপালে তিব্বতি শরণার্থীদের স্থান দেওয়া হয়েছে।

একদিকে সেনাবাহিনীর ছাউনি ও অপরদিকে শরণার্থীদের দখলদারি অভিযানকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা সরকারি বনবিভাগের নেই, থাকতে পারে না। বনরক্ষা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। কাঠের অসৎ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে, এবং শরণার্থীদের আলুচাষ থেকে হিমালয়ের ভঙ্গুর জমিকে তারা রক্ষা করতে পারছে না। বেআইনিভাবে গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের সহযোগিতায়। এই সমস্ত লুঠপাটের ফলে আজ হিমালয়ের উৎপত্তি এলাকা বরাবর বনাঞ্চল চীনারা ধ্বংস করে নিয়ে যাচ্ছে।

বড় বড় মোটর রাস্তা বানিয়েই চলেছে ভারত সরকার— এই হিমালয়ের ভঙ্গুর পাহাড়ের গা দিয়ে প্রতিরক্ষার স্বার্থের স্পর্শকাতর ভঙ্গুর হিমালয়ের এলাকাগুলি তার ফলে আরও ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। হিমালয়ের স্বাভাবিক বন ও খনিজ সম্পদ, বন্যপ্রাণী, বন-সম্পদ এভাবে লুঠ হয়ে যাচ্ছে। যারা এই সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের হাতেই এসব অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত হয়ে গেছে। সাধারণ সরকারি প্রশাসন যন্ত্র এদের হাতে আজ পঙ্গু হয়ে আছে।

যে যে রাষ্ট্র হিমালয়ের যে যে অংশ দখল করে আছে, তাদেরই দায়িত্ব হিমালয়ের সেই সব এলাকার উন্নতি সাধন ও সংরক্ষণের। ভারতে কাশ্মীর থেকে বর্মা সীমান্তবর্তী তহশিলগুলিকে আজ রীতিমত জেলা বলে পুনর্গঠিত করে নেওয়া হয়েছে। নব গঠিত এই সব সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির উন্নয়নের নামে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু এইসব উন্নয়নের প্ল্যান ও কর্মকাণ্ডের ধারা দিল্লি থেকেই আসে, সেই হেতু এসব এলাকায় প্রধানত বড় বড় মোটরবাহী গাড়ির জন্য পাকা রাস্তা তৈরি করার অগ্রাধিকারই পেয়ে থাকে বেশি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ও স্থানীয় অধিবাসীদের হাত থেকে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আমলাতন্ত্রের হাতে চলে গেছে। পর্বতবাসীদের স্বাধীন চিন্তা ও চেতনায় প্রচণ্ড আঘাত পড়েছে, আর হাইল্যান্ডারদের স্বাভাবিক স্বাধীন চাল চলনেও বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

আজ আমরা দেখছি হিমালয়ই কেবল মরে যাচ্ছে না— পরিবেশের দিক থেকে, তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোও ভেঙ্গে পড়ছে। নানা ধরনের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় হাতুড়ে ব্যবস্থাপনা এনে এই অধোগতিকে আরও ত্বরান্বিত করে তুলছে। তাদের মধ্যে আছে নানা ধরনের জলসংরক্ষণ বা water shed development পরিকল্পনা, যাদের পরিকল্পনা ও আর্থিক জোগান জুটিয়ে দিচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং ইয়োরোপের কোন না কোন দেশ। এসব কাজের প্ল্যান ও অর্থ— উভয়ই আসে বিদেশ থেকে। স্থানীয় লোকজনদের অজান্তেই এসব পরিকল্পনা নেওয়া হয়। জনসাধারণের সহযোগিতা এতে থাকে না, এবং এসব পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত দেশের লোকদের কোন কাজে আসে না। বিদেশী পুঁজি ও প্রকল্পদারেরাই এতে লাভবান হয় আর দেশটা ঋণগ্রস্ত ও দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনে যে সমস্ত গাছ-গাছড়া লাগানো দরকার— যা একাধারে স্থানীয় লোকজনদের নিত্য ব্যবহার্য ও গরু বাছুরের প্রয়োজনীয় খাদ্য— সে সব গাছড়া বা বনাঞ্চল সৃষ্টি না করে, জোর দেওয়া হয় বিদেশ থেকে আনা নানা জাতের গাছ যাতে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে লাগে।

সম্প্রতি পার্বত্য এলাকার স্বার্থরক্ষার কাজে নিযুক্ত উত্তরপ্রদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী তাঁর আসন্ন নির্বাচনী সফরে বলেন যে সরকার এইসব পার্বত্য অঞ্চলে আধুনিক মানের নানা হোটেল খোলার প্রোগ্রাম নিয়েছে— ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট-এর স্বার্থে। এই নিয়ে খুব বড় একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে দেশে এবং বিদেশের পুঁজিপতি হোটেল ব্যবসায়ীরা হিমালয়ে নানা উন্নত মানের হোটেল স্থাপন করবে। অনেক বিদেশী ভ্রমণকারীদের সঙ্গে বিদেশী অর্থও এদেশে আসবে এবং স্থানীয় জনসাধারণও তাতে উপকৃত হবেন। এর ফলে স্থানীয় যুবকদের আর বাইরে যেতে হবে না। এখানেই নানা রকম আয় করতে পারবে। তেহরি গাড়োয়াল অঞ্চলে চায়ের বাগান করার পরিকল্পনাও নাকি আছে— এবং তাও দেখা হচ্ছে। এ বাবদ বিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে।

হিমাচল প্রদেশে ট্যুরিজম অনেকটাই প্রসার হয়েছে। এবং কাশ্মীরে তো বটেই। এসব স্থানে পাঁচতারা হোটেল খোলার জন্য প্রতিযোগিতা পড়ে গেছে। এবং এসব পাঁচতারা হোটেলগুলি প্রায় রাজনৈতিক দলপতিদের হাতে গড়ে উঠছে। চম্বা মুসৌরি বেল্টে (তেহরি গাড়োয়াল এলাকায়) এই সব পাঁচতারা হোটেলের মালা সৃষ্টি হচ্ছে। পঁচিশ বছর আগে বিরাট এক ওক জঙ্গল কেটে ফলের গাছের বাগান করা হয় এই এলাকাতে। এখন এই ফলের বাগানগুলি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে— ফলের বাগান শূন্য হয়ে যাচ্ছে, এবং

সেসব জমি এখন দিল্লির লক্ষপতি কোটিপতিরা কিনে নিচ্ছেন হোটেল ব্যবসা চালু করার জন্য। এই কেনাবেচার ব্যাপারে লিপ্ত আছেন একজন প্রাক্তন মন্ত্রীও। বর্তমান মুলায়ম সিং সরকারও এই সব এলাকাতে বিদেশী মদের অনেকগুলি দোকান খুলতে দিয়েছেন। এমনকি ভাটোয়ারী, উত্তরকাশী, যোশীমঠ, রুদ্রপ্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিতেও— ধনী ভ্রমণকারীদের জীবন-বিলাসের স্বার্থে। এইসব মদের দোকানগুলি পরিচালিত হবে উত্তপ্রদেশ সরকারের সুপার কর্পোরেশন ও হিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের তদারকিতে।

এই ধরনের পাঁচতারা হোটেলের উন্নয়ন প্রকল্পের কী মারাত্মক পরিণতি হবে তার জন্য সরকারি উদ্যোগেই গাড়োয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বে উত্তরপ্রদেশ সরকার একটা স্টাডি-টিম বসিয়েছে। হর-কি-দুন টন উপত্যকায় একটি প্রসিদ্ধ মনোরম দৃশ্য প্রধান স্থান এবং সেই পথে বহু পরিব্রাজক ঐ সব সুদৃশ্য দেখতে চলেছে— তার সঙ্গে আত্মসংযম ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের যে দীর্ঘ ঐতিহ্য ঐ সব অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছিল, তাতেও ধস নামছে। এই সব উন্নয়নের ফলে কি লাভক্ষতি তা দেখার জন্য যে কমিটি করা হয়েছিল তাতে একস্থলে লিখিত আছে: The construction of the rest houses on the basis of five-star culture makes it clear that the people who need five star facilities are proposed to be attracted in this area.This five star culture of the moneyed and luxurious people will certainly pressurize the local culture which will certainly kill the special culture of the area.

যে অর্থ এইভাবে বিলাসবহুল হোটেলের মারফত এই সব অঞ্চলে আসে ও আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সব বিলাস দ্রব্য বাজারে চালু হচ্ছে ও হবে, তার ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য স্থানীয় লোকদের মধ্যে ঘটতে থাকবে--- ব্যবসায়ীদেরই তাতে প্রচুর ফায়দা হবে। কিন্তু এতকাল তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীদের মারফত যে অর্থ পাহাড় অঞ্চলে আসত তার সবটাই পেত স্থানীয় সাধারণ লোকেরা। সেই সব তীর্থযাত্রীরা তাঁদের জীবনের সহজ সরল জীবনভঙ্গী ও আদর্শের ছাপটা স্থানীয় লোকদের উপরে ফেলে যেত। ভুটান তাই সেই ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে তাদের দেশে পাঁচতারা হোটেল উঠতে দেয়নি বা এখনও দিচ্ছে না।

হিমালয়ের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর হল বিদেশ থেকে আনা উন্নয়নপ্রকল্প, যার লক্ষ্য হল প্রত্যেক জিনিসের মূল্যায়ন হয় তার অর্থমূল্য বা ক্যাশের পরিমাণ দিয়ে। একদিকে হিমালয়ের নিজস্ব বৃক্ষসম্পদের উচ্ছেদ ও অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে বিদেশী গাছগাছড়ার চাষ— এই উভয় প্রক্রিয়া স্থানীয় পার্বত্য জনসাধারণের জীবন বিপন্ন করে তুলছে— তারা তাদের গৃহপালিত গরু বলদ জীবজন্তু নিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তাদের জীবনযাত্রার উপায় ও প্রণালীর উপরেই প্রচণ্ড আঘাত পড়ছে বনজঙ্গল থেকে রুজি রোজগার ও জীবন ধারণের সাধারণ সম্পদ আজ আর হিমালয়ের অনেক অঞ্চলেই নেই বা ফুরিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ লোকেরা সাধারণত পশুপালন, চাষ, বনজঙ্গলের সাধারণ সম্পদ (মাইনর ফরেস্ট প্রোডাক্টস), বনৌষধি, ফল-মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করেই জীবনধারণ করত। এখন তারা হয় সরকারের অধীনে এক মজুর শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে, অথবা বৃহৎ শিল্পপতি পুঁজিপতি ও খনি বা খাদের মালিকদের শ্রমদাসে পরিণত হচ্ছে। এ ধরনের উন্নয়ন (?) প্রকল্পের ফলে হিমালয়ের দুন উপত্যকা ও পশ্চিমবাংলার ভুটান সীমান্তের পাগলি নদী বরাবর বিস্তৃত অঞ্চল মরুভূমি সদৃশ হতে চলেছে। হিমালয় প্রদেশে সিমেন্ট শিল্প এখন কাঙ্গাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই পুন্টা ও বিলাসপুর এলাকার ধ্বংসসাধন করে ফেলেছে।

কিন্তু সর্বোপরি যা সর্বনাশ সাধন করতে চলেছে, তা হল হিমালয়ের মধ্যে বড় বড় জলাধার বা ড্যাম তৈরির উদ্যোগ। এগুলিই শেষ পর্যন্ত হিমালয়ের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়ে ছাড়বে। এই সব পরিকল্পিত ড্যামদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে গাড়োয়াল। তেহরিতে ২৬০.৫ মিটার উঁচু ড্যাম করার পরিকল্পনা চলছে, যথা— লাখ-ওয়ার (এখনই করা শুরু হয়ে গেছে) দামতা, কোট্রি-ভাল, ভৈরঘাঁটি, উত্যাসু, কর্ণপ্রয়াগ এবং বাদুলি বাগোলি— এসব স্থানে ড্যাম রচনার মাপজোক চলছে। কুমায়ুন পর্বতের পঞ্চেশ্বর, নেপালের চিসাপানি এবং অরুণাচল প্রদেশেও একটা বিরাট ড্যামের কাজ চলছে; রাশিয়ার সাহায্যেই ড্যাম করা হচ্ছে। অথচ রাশিয়াতেই এত ড্যাম করা হয়েছে যার মোট প্রকল্প এরিয়া সমগ্র ফরাসী দেশের সমান, এবং তার ব্যর্থতা এখন অনুভূত হচ্ছে। বস্তুত ড্যাম রচনা হল দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার ক্ষণকালিক সমাধানের প্রচেষ্টার মতো।

শোনা যায় বিদেশী ঋণ পাবার জন্য চেষ্টা চলছে, এদেশের আরও ড্যাম করার জন্য। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে

বর্তমান তেহরি ড্যামের জন্য ঋণ পাওয়া যাচ্ছে, সোভিয়েত রাশিয়াতে যে বিপুল সংখ্যক বেকার ইঞ্জিনিয়ার ও নানা যন্ত্রপাতি অচল হয়ে পড়ে আছে তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র এখন ভারতের মতো পিছিয়ে পড়া দেশে নিয়োগ করার চেষ্টা চলছে। সোভিয়েত রাশিয়াতে একদা সমস্ত উত্তরগামী নদীসমূহকে দক্ষিণগামী করার একটা বিরাট চেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হওয়ায় এখন সেসব যন্ত্রপাতি ও বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের ভারতের মতো সাহায্য প্রার্থী দেশগুলিতে চালান দেবার চেষ্টা চলছে। বিশ্বব্যাঙ্কের লোভী দৃষ্টিও পড়েছে আজ হিমালয়ের নৈঃসর্গিক সম্পদের উপরে। কেননা বিশ্বব্যাঙ্ককে সুদের টাকা তুলতেই হবে এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক স্বার্থও রক্ষা করতে হবে। এখন আবার একজন নতুন সহকারীও এসে উপস্থিত, সে হল জাপান। জাপান পাকিস্তানকে ৮.২ বিলিয়ন ডলার ধার দিয়েছে ১৪২ মিটার উঁচু তারাবেলা ড্যাম তৈরি করার জন্য— যেখানে ইতিমধ্যেই ভূমিকম্পের উৎপাত দেখা দিয়েছে এবং উক্ত ড্যাম রচনা হয়ত পরিত্যক্তও হতে পারে শেষ পর্যন্ত। হিমালয়ান রিভার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট নামে পৃথিবীর দশটি বৃহত্তম প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হিসেবে এখন উচ্চ পর্যায়ে বিচার বিবেচিত হচ্ছে এবং জাপান এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। তেহরি ড্যাম নিয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য যে আন্তর্জাতিক কমিশন বসানো হয় সেই কমিশনও তেহরি ড্যাম বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করে এবং সোভিয়েত দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কেউ কেউ এই তেহরি প্রকল্পের বিপজ্জনক পরিণাম সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন (যথা— Kellis Borck and his associates in U.S.S.R Science Academy-র সর্বসম্মত আপত্তিজনক মতামত)। এযাবৎ ৪১৪ কোটি প্রকল্পের জন্য ৪৫০ কোটি ইতিমধ্যেই ব্যয় হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত এর খরচ হাজার কোটি টাকাতে উঠে আসবে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। কেউ বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নয় এই ভেবে যে এই তেহরি প্রকল্প একদিন হৃষীকেশ, হরিদ্বার প্রভৃতি শহর বিপন্ন করে তুলতে পারে— এমনকি সুদূর মিরাট, বুলন্দসর প্রভৃতি পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের শহরগুলিকে ধ্বংস করে দিতে পারে— যদি ড্যাম অঞ্চলে বিপদ ঘটে প্রবল ভূমিকম্পের ফলে। তখন দিল্লীর পাঁচতারা হোটেলের সুইমিং পুলগুলিও বিরাট শিল্পাঞ্চলকে নিয়ে বিপন্ন হতে পারে।

হিমালয়ে বৃহৎ জলাধার (ড্যাম) করার বিপদের সবদিকটা কেউ ভেবে দেখছে না। জলাধার থেকে যতটা জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা যাবে, তার থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হবে উৎপাটিত শরণার্থীদের পুনর্বাসন ব্যবস্থায়। অর্থাৎ উপকার যতটা হবে, সার্বিক অপকার হবে তার চেয়ে অনেক বেশি।

সি কে শর্মার নেতৃত্বে ওয়াটার অ্যান্ড এনার্জি কমিশন বসানো হয়েছে— নেপালের জন্য, সেই কমিশনের রায়ে একটা আলো দেখতে পাওয়া যায়। হাই ড্যাম-এর বদলে লো ওয়্যার ড্যামের পরিকল্পনা অনেক বেশি যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়। একটা বড় ড্যামের পরিবর্তে বেশ কয়েকটা লো-ওয়্যার জলাধার করলে জলবাহিত বালি মাটি একটা বৃহৎ উঁচু ড্যামে পড়ার চেয়ে বিভিন্ন ছোট ছোট (লো ওয়্যার) ড্যামে পড়লে হাই ড্যাম-এর বিপদের ঝুঁকি অনেক কমে যায়, অথচ বালি মাটিতে ড্যামটা সহসা ভরে যেতে পারে না। সেই জলাধারের জলসংরক্ষণ ক্ষমতা অনেকটাই সুরক্ষিত হয়। কিন্তু নেপালের এই কমিশনের সুপারিশ ভারত সরকার মানবে কি?

এই আলোচনার মূল বক্তব্য হল এই যে হিমালয়ের সম্পদগুলিকে ব্যবসায়িক স্বার্থে, ধনীদের স্বার্থে ব্যবহার করতে গেলে সমূহ বিপদ ডেকে আনা হবে।

তাছাড়া হিমালয়ের একটি প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি। ১৯০১ সাল থেকে ১৯৮১ এই আশি বৎসরে হিমালয়ের জনসংখ্যা ১১,১১৮,০১০ থেকে ৩৩১৬৭,১১২-তে উঠে এসেছে। প্রতি বর্গ কিলোমিটার জনবসতি ১৮.২০ থেকে বেড়ে ৫৪.১৯-এ উঠে এসেছে। দ্বিতীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত হিমালয়ের নারীদের কঠোর পিঠভাঙ্গা পরিশ্রম থেকে তাদের জীবনকে একটু সহজ করা। অধুনা বাজার অর্থনীতি (মার্কেট-ইকনমি) চালু হবার ফলে এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম তাদের অনেক বেড়েছে— এবং জীবনযাত্রা দুরূহ হয়ে পড়েছে। হিমালয়ের বনজঙ্গল, জল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রধানত হিমালয়বাসীদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হওয়া দরকার। বড় বড় ড্যাম করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার নীতির পরিবর্তে হিমালয়ে যে অসংখ্য ছোট বড় ঝরনা ও জলপ্রপাত আছে, সেসব থেকে ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যম নেওয়া, এবং সর্বত্র ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কাণ্ড গড়ে তোলা এবং তার ব্যবহার করা— স্থানীয় লোকদের স্বার্থেই।

হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে হলেও স্থানীয় লোকদের প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়া

লাগাতে হবে এবং হিমালয়কে আবার সবুজ করে তুলতে হবে। গরু-বাছুরের খাদ্য বা fodder যে সব গাছ-গাছড়া ঘাস পাতা থেকে হয়, সেগুলির উপর জোর দিতে হবে— যা আজকে চিপকো আন্দোলনের মারফত তেহরি গাড়োয়াল জেলায় বেশ কিছু গড়ে উঠছে স্থানীয় মহিলা মঞ্চ দলগুলির উদ্যোগে ও উদ্যমে। পাঁচতারা হোটেল ও তার আনুষঙ্গিক দৃষ্টিকে বর্জন করতে হবে— হিমালয়কে দেশী বিদেশী পুঁজির লুটের ক্ষেত্র হতে দিলে চলবে না।

বর্তমান সরকারি নীতির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীকরণ নীতি স্থানীয় লোকদের হাত থেকে সকল ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে। স্থানীয় লোকেরা তাদের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রশাসনের ক্ষেত্রেও এই বিকেন্দ্রীকরণ এখন অতি আবশ্যকীয়— না হলে কোন উন্নয়ন উদ্যোগেও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব নয়।

অধিকতার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাবলম্বী অর্থনীতির কর্মকাণ্ড হিমালয়ের অসীম সম্পদের সদ্ব্যবহারে সাহায্য করবে। লুণ্ঠন নীতির বদলে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করলেই হিমালয়ের অশেষ সম্পদকে রক্ষা করেই জনসাধারণের জন্য একটা সুস্থ জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

পৃথিবীর বৃহত্তর সাম্রাজ্য অর্থাৎ সোভিয়েত রাশিয়ার Rogun Dam-এর বিরুদ্ধে আজ রাশিয়ায় তাজাকিস্তানের জনগণ বিপুল বাধা সৃষ্টি করে তা বন্ধ করতে চলেছে। এজাতীয় প্রতিরোধ ক্ষমতা স্থানীয় লোকদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটলেই সম্ভব। এদেশেও আজ সব রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্রে বসে হিমালয় সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে। আবার হিমালয়কে নিয়ে একটা সার্বিক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নীতি যদি কার্যকর করতে হয় তবে হিমালয়কে ঘিরে আমাদেরপ্রতিবেশি যত রাষ্ট্র আছে যথা— পাকিস্তান, নেপাল, তিব্বত, চীন, ভুটান, ব্রহ্মদেশ— সবার সঙ্গে একটি সর্বসম্মত নীতি তৈরি করতে হবে, যা গঠনমূলক ও সৃষ্টিশীল। এবং তা নির্ভর করে হিমালয়কে ঘিরে যারা বা যেসব দেশ আছে তাদের মধ্যে একটা শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করার উপরে। হিমালয়কে এখন আর আত্মরক্ষার জন্য সামরিক ঘাঁটি হিসেবে দেখলে চলবে না, বরং পৃথিবীতে শান্তি আনবার একটা মিলনভূমি, মিলনের উচ্চভূমি, বাতাবরণ ও স্থিতি হিসেবে দেখতে হবে।

— ভাষান্তর : নিরঞ্জন হালদার

উমা

কাণ্ডজ্ঞান (১৫)

ধ্যানচাঁদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা

আশীষ লাহিড়ী

নীরজ চোপরা জ্যাভেলিন ছুঁড়ে অলিম্পিকে সোনা পাওয়ার পর হঠাৎ করে এতদিন পর ধ্যানচাঁদ (১৯০৫-১৯৭৯)-এর কথা অনেকের মনে পড়েছে। সেই যাঁকে হকির জাদুকর বলা হত, যাঁর ড্রিবলিং দেখে মনে হত, হকি স্টিকে বুঝি আঠা লাগানো আছে। আর যিনি ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। ভারতকে এনে দিয়েছিলেন সোনা; তখন অবশ্য ভারত মানে ব্রিটিশ-ভারত। ধ্যানচাঁদের পাসপোর্ট ব্রিটিশ পাসপোর্ট।

১৯৩৬-এর বার্লিন। শুনলেই বুক কাঁপে। হিটলার তখন ক্ষমতায়, জার্মানদের রক্ত-শুদ্ধির জন্য অনার্য ইহুদিদের সাবাড়-অভিযান চলেছে। শুদ্ধ আর্য রক্ত যার গায়ে নেই, সে হিটলারের জার্মানির নাগরিক হবার যোগ্য নয়। কৃষ্ণাঙ্গ আর নাতি-কৃষ্ণাঙ্গদের তিনি মানুষ বলেই মনে করেন না। শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্বর প্রতিভূ ইংরেজদের তাঁর খুব পছন্দ। ভারত অধিকার করে ইংরেজরা খুব ঠিক কাজ করেছে; 'পারলে আমিও করতুম।' তাঁর স্বপ্নে তখন সোভিয়েত রাশিয়া। 'রাশিয়া হবে আমার ভারত', বলেছিলেন তিনি। ওই রকমই, ওর চেয়েও, কড়া হাতে অসভ্য রাশিয়ানগুলোকে শায়েস্তা করবেন তিনি, লুটে নেবেন উক্রাইনের সম্পদ, আরামে বৈভবে থাকবেন, আর খিদমতগারি করবে হতভাগা বলশেভিকগুলো।

এ অবস্থায় জার্মানিতে অলিম্পিকের খেলা। হিটলারের একেবারেই ইচ্ছে ছিল না যে কতকগুলো অর্ধসভ্য অ-শ্বেতাঙ্গ বর্বর বার্লিনের পবিত্রতা নষ্ট করুক। কিন্তু পরে তিনি ভেবে দেখলেন, এই সুযোগে বিশ্বের কাছে নাৎসি জার্মানির উদারতার একটা অভিজ্ঞান তো রাখা যাবে। এই এতগুলো দিন ধরে এতগুলো ইহুদি, এতগুলো কেলেমানিক, স্লাভ আর বাদামি ছোটোলোক যে খেয়েদেয়ে বার্লিনে কাটাল, তাদের কাউকে তো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পোরা হল না,

কিংবা খুন করা হল না। তাহলে? হিটলারি জার্মানির আর্য মহত্বর কোনো তুলনা হয়? সত্যি, কী অপপ্রচারটাই না চলে মহান হিটলার সম্বন্ধে! সুতরাং বমি চেপে, নাকে কাপড় চাপা দিয়ে হিটলার অশ্বেতাঙ্গ আর অনার্যদের দাপাদাপি সহ্য করে নিলেন। ক-টা দিনের তো ব্যাপার। মিথ্যা-প্রচারকে যিনি সুচারু শিল্পে পরিণত করেছিলেন, সেই গোয়েব্‌লসকে বললেন খুব যত্ন করে অলিম্পিকের ডকুমেন্টারি তুলতে আর তাতে জার্মানির জিতের সঙ্গে জার্মানির হারগুলোও যেন দেখানো হয়, যাতে লোকে তাদের একলষেঁড়ে না-বলতে পারে। গোয়েব্‌লস্ এই ডকুমেন্টারি তোলার ভার দিলেন প্রসিদ্ধ তথ্যচিত্র-নির্মাতা লেনি রিয়েফেনস্টাল-কে। তাঁরই সৌজন্যে ধ্যানচাঁদের অবিশ্বাস্য স্টিক-কারিকুরির কিছু নমুনা ধরা রইল উত্তরপুরুষের জন্য।

বার্লিন অলিম্পিকে হিটলারের মুখে প্রথম ঝামাটা ঘষলেন জেসি ওয়েন্স।

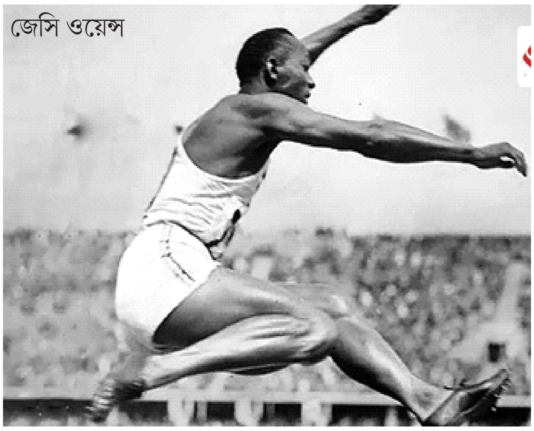

জেসি ওয়েন্স

খেয়েদেয়ে কাজ নেই, এই কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাথলিট বেয়াক্কেলের মতন চার-চারটে সোনা জিতে বসলেন : ১০০ মিটার দৌড়ে, ২০০ মিটার দৌড়ে, লং জাম্পে আর ৪ x ১০০ মিটার রিলে রেসে। ১৯৩৬-এর অলিম্পিক খেলায় সবচেয়ে বেশি পদক জিতলেন ওই কৃষ্ণাঙ্গই। আর সাংবাদিকগুলোও তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে তারা চিৎকার জুড়ে দিল : ওয়েন্স একা-হাতে (নাকি একা-পায়ে?) হিটলারের আর্য-শ্রেষ্ঠত্বর কল্প-ফানুসটা ফাটিয়ে দিলেন। বেচারি হিটলার। বাধ্য হয়ে তাঁকে ওয়েন্সের কালো হাত ধরে অভিনন্দন জানাতে হল। নিশ্চয়ই বাড়ি গিয়ে পবিত্র রাইন নদীর জলে হাত শুদ্ধ করে নিয়েছিলেন তিনি। তবে হিটলার নাহয় ঘোষিত ''আর্য''; কিন্তু ওয়েন্সের গণতন্ত্র-প্রেমী রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট? ওয়েন্সের নিজের ভাষায়, 'হিটলার আমাকে ছোটো করেননি— করেছিলেন আমাদের প্রেসিডেন্ট। তিনি আমাকে একটা তারবার্তাও পাঠাননি।' কেউ ঘোষিত বর্ণবিদ্বেষী, কেউ অঘোষিত, এই তফাত।

সেই ১৯৩৬-এর বার্লিন অলিম্পিকে ধ্যানচাঁদের অধিনায়কত্বে ভারতীয় হকি দল কেমন খেলেছিল? গোটা টুর্নামেন্টে মাত্র একখানা গোল খেয়েছিল তারা। আর সে-গোলটাও খেয়েছিল একেবারের ফাইনাল ম্যাচে। গোলটা হয়েছিল একটা আকস্মিক ঘটনার সুবাদে। ধ্যানচাঁদের কথায়: 'জার্মানরা যখন চার গোলে হারছে, হঠাৎ একটা বল [ভারতের গোলকিপার] অ্যালেনের প্যাডে লেগে ঠিকরে ফেরত আসে। জার্মানরা তার পূর্ণ সুযোগ নেয়; আমরা বলটাকে থামাবার আগেই ওরা বলটাকে নেটের মধ্যে ঠেলে দেয়।' ম্যাচটা ভারত জিতেছিল ৮-১ গোলে। প্রতিপক্ষ? আর কে? সেই আর্য-শ্রেষ্ঠত্বর ধারক ও বাহক জার্মানি।

বাকি ম্যাচগুলোতে ধ্যানচাঁদের দলের খতিয়ান: হাঙ্গেরি ০-৮, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ০-৭, জাপান ০-৯, সেমি ফাইনালে ফ্রান্স ০-১০। ধ্যানচাঁদ আর তাঁর ভাই রূপচাঁদ দুজনে মিলে দিয়েছিলেন বাইশখানা গোল — ভাগ সমান-সমান।

জার্মানির বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচটি সম্বন্ধে ধ্যানচাঁদ পরে আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন: প্রথমটা 'জার্মানদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তারা একটা এলেবেলে দলের সঙ্গে খেলতে নেমেছে।' তার কারণ আছে। এর আগে একটা প্র্যাকটিস ম্যাচে জার্মান দল ভারতীয়দের ৪-১ গোলে হারিয়েছিল। কী পরিস্থিতিতে এটা ঘটেছিল? দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর জার্মান ভূমিতে পা রেখে ভারতীয় দলটি সেইদিনই ট্রেনে করে পৌঁছেছিল বার্লিন; আর সেইদিনই তাদের প্রথম প্র্যাকটিস ম্যাচটি ফেলতে হয়েছিল জার্মানির সঙ্গে। ক্লান্ত অবসন্ন মানুষগুলি যে তার পরেও জার্মানিকে একখানা গোল দিতে পেরেছিলেন, এটাই আশ্চর্যের। যাহোক, তবু জয় জয়ই। সেই জয়ের তাড়সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলাটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

১৫ আগস্ট ১৯৩৬ হকি ফাইনাল ম্যাচ শুরু হল। খেলা হবার কথা ছিল ১৪ই, কিন্তু সেদিন বৃষ্টিতে মাঠ ভেসে

গিয়েছিল। স্টেডিয়ামে বিশ হাজার জার্মান আর পঞ্চাশ জন ভারতীয় (তাঁদের মধ্যে একজন বরোদার মহারাজা, অন্যজন ভূপালের রানি)। মাঠে ঢোকবার আগে ভারতীয় দল, যারা রাজনৈতিক বিচারে ব্রিটিশ নাগরিক, তারা সেলাম ঠুকল ভারতের তেরঙা পতাকাকে। খেলা শুরু হল। জার্মানি ভালোই ঠেকাচ্ছিল ভারতকে। ভারতের প্রথম গোলটা হল বিরতির তিন মিনিট আগে। বিরতির পর শুরু হল ধ্যানচাঁদের জাদুর খেল। দ্বিতীয়ার্ধের সাত মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় গোল, আর তেরো মিনিটের মাথায় গিয়ে দেখা গেল ভারত ৬-০-য় এগিয়ে।

বেচারি জার্মানরা বড়োই মুষড়ে পড়ল। মুষড়ে পড়লে মানুষের কাণ্ড লোপ পায়, মেজাজ চড়ে। জার্মানির গোলকিপার অনার্য ধ্যানচাঁদের মুখে সপাটে স্টিক দিয়ে মারলেন। ছিটকে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন ধ্যানচাঁদ। একখানা দাঁত খসে পড়ল। রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন। শুশ্রূষা নিয়ে খানিক পরে মাঠে ঢুকলেন। সাথীদের বললেন, গোল করার দিকে মন দিও না, গোল আপনিই আসবে, এখন কেন 'বল নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে তার একটা শিক্ষা দেব ওদের।' সেটাই হবে ওদের উচিত শিক্ষা, সেটাই হবে ওদের আর্য গরিমার ফানুসে আসল খোঁচা। শুরু হল এক আজব খেলা। নিমেষে ভারতীয়রা বল নিয়ে তটস্থ বিপক্ষের গোলের একেবারে মুখে চলে আসে, আর বারে বারেই সেখান থেকে বল ফেরত নিয়ে ঘুরে চলে আসে। তার মধ্যেই, দেব-না দেব-না করেও তিনখানা গোল দিয়ে ফেললেন ধ্যানচাঁদ। জার্মান খেলোয়াড়রা হতভম্ব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই তাদের; মাঠে যেন একটাই দল, সেই দল নিজেদের মধ্যে যা-খুশি তাই করছে বল নিয়ে। স্টেডিয়ামের ২০,০৫০ জন দর্শকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাঠের ভিতরের আরো এগারো জন। এ যেন ভিন্ন অর্থে ছেলেখেলা। গোলের ব্যবধানে হারানোটা তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার, আসল হারানোটা হল, আর্য জার্মানরা যে হকি খেলায় সূক্ষ্ম দিকগুলো জানেই না, সেটা তাদেরই মাঠে নেমে বুঝিয়ে দেওয়া।

ওয়েন্সের পর এই আরেকটা ঝামা-ঘষা হজম করতে হল হিটলারকে। তার উপর, উন্নত kultur-এর পরিচয় দিয়ে তাঁর আর্য গোলকিপার ধ্যানচাঁদকে লাঠি কষিয়ে দাঁত ভেঙে দিয়েছে, এ খবর— হয়তো এ-ছবিও রটে গেছে। এবার চাই ড্যামেজ কন্ট্রোল।

সন্ধেবেলা এক জার্মান অফিসার ধ্যানচাঁদকে জানালেন, ফুয়েরার সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। হিটলারের একপাশে বিশ্বের সর্বকালের ধাপ্পা-সার্বভৌম জোসেফ গোয়েব্‌ল্‌স, অন্যপাশে জার্মানির কুখ্যাত এস এস বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হাইনরিখ হিটলার। ধ্যানচাঁদ লিখেছেন: আমি ফুয়েরাকে সেলাম করলাম। হিটলার আমাকে আগাগোড়া এক ঝলক মেপে নিলেন। আমি লম্বা লোক নই। যে-একটিমাত্র কোট আমার ছিল, সেইটি আর একটা সাদা প্যান্ট ছিল আমার পরনে, পায়ে ছিল ক্যাম্বিসের পিটি (ফিজিক্যাল ট্রেনিং) জুতো।

'তাহলে আপনিই সেই হকি-জাদুকর যাঁকে সবাই আজকের ম্যাচের গতি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য দোষ দিচ্ছে? অভিনন্দন, আজ অসাধারণ খেলেছে আপনার দল। শুনলাম ম্যাচে আপনি জখম হয়েছেন। এখন কেমন আছেন?'

মৃদু হেসে ধ্যানচাঁদ শান্তভাবে হিটলারের দিকে চেয়ে

ধ্যানচাঁদ ও হিটলার

বললেন, 'শুক্রিয়া জনাব। আজকের ম্যাচে আমার একটা দাঁত জার্মানির জন্য রেখে গেলাম। এছাড়া ভালোই আছি। আপনাদের আতিথেয়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'

একটু হেসে হিটলার আবার বললেন, 'হকি খেলা ছাড়া অন্য সময়ে কী করেন?'

'জনাব, আমি তো ইন্ডিয়ান আর্মিতে কাজ করি।'

'কোন পদে?'

'আজ্ঞে, নায়েক বা করপোরাল।'

'করপোরাল? অল্প বয়সে আমিও তাই ছিলুম। হের ধ্যানচাঁদ, আপনার এত গুণ, এত ক্ষমতা, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে আপনার মতো একজন লোককে ব্রিটিশরা মূল্য দেয় না। আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, আপনি জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগ দিন— অফিসার হিসেবে। দলের জন্য কী করে ছিনিয়ে আনতে হয় তা যে আপনার জানাই আছে, সে তো পরিষ্কার।'

সবাই চুপ। চারপাশের নাৎসিরা অধীর প্রত্যাশায় ধ্যানচাঁদের মুখের দিকে চেয়ে। ধ্যানচাঁদ তাঁর দোভাষীকে বললেন, 'অনুগ্রহ করে মহামহিমাকে জানিয়ে দিন, তাঁর এই উদারতা পূর্ণ প্রস্তাবে আমি গভীরভাবে সম্মানিত বোধ করছি। আমার পদ যত নিম্নই হোক, আমি একজন ভারতীয়, ভারত আমার দেশ। আমার নিজের দেশের মানুষজনের মাঝখানে একজন সামান্য করপোরাল হয়ে থেকে আমি সুখেই আছি।' হিটলার মাথাটা সামান্য নাড়লেন, আবার ধ্যানচাঁদের দিকে চাইলেন, তারপর অন্যদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য চলে গেলেন।

স্বয়ং হিটলারের প্রস্তাবে নাৎসি বাহিনীতে অফিসার হয়ে যোগ দেবার প্রস্তাব হেলায় উপেক্ষা করে ধ্যানচাঁদ কি কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিলেন?

মনে হয় তাই। নইলে হয়তো এমন বেঘোরে লিভার ক্যানসারে মরতে হত না তাঁকে তাঁর সাধের স্বদেশে। ১৯৭৯ সালে তাঁর অসুখ ধরা পড়ে। 'পদ্মভূষণ' ধ্যানচাঁদের সম্বল মাসিক দুশো টাকা পেনশন। দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকাল সায়েন্সেস-এ ভর্তি হতে গেলেন। একজনও চিনল না তাঁকে। ভর্তি হলেন জেনারেল ওয়ার্ডে। তার বারো দিন পর ৩ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

মারা যাবার দুমাস আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: 'আমি জানি, আমার মরবার সময় বিশ্ব কাঁদবে, কিন্তু ভারতের মানুষ একফোঁটা চোখের জলও ফিলবে না।'

উমা

একটি আন্তরিক আবেদন

মাননীয় মহাশয়,

আমি আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের পৌত্র। আমার নাম আনন্দকুমার রায়। আমরা বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটি অন্তর্গত ২১নং ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা।

আমার বর্তমান বয়স ৭৪ বছর। আমি অসুস্থ এবং বৃদ্ধ নিঃসন্তান। আমি বর্তমানে আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির একমাত্র জীবিত বংশধর।

আমার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে কতিপয় স্থানীয় দুষ্কৃতকারী যোগেশচন্দ্র রায়ের বসত বাড়ী দখলের চেষ্টা করিতেছে।

যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি একাধারে পণ্ডিত, জ্যোতির্বিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, বৈজ্ঞানিক এবং আরও অনেক বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন।

যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন রাজ্যপাল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হরেন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-এর সমস্ত সদস্যবৃন্দ ১৯৫৬ সালে ১৭ এপ্রিল বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজে বিশে সমাবর্তন করিয়া তাঁহাকে ডি-লিট উপাধিতে সম্মানিত করেন।

আমি বাড়ীটি ও তাঁর স্মৃতিচিহ্ন সমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় আমি আপনাদের সহযোগিতা ও উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন করিতেছি।

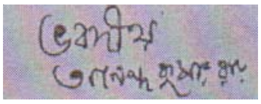

(আনন্দকুমার রায়)

তাং- ১৩ আগস্ট
স্বস্তিকা, যোগেশপল্লী
বাঁকুড়া - ৭২২১০১
মো - ৯৪৭৪৩৮৬১২৫

আমাদের নতুন প্রকাশনা
কাণ্ডজ্ঞান
আশীষ লাহিড়ী
(যন্ত্রস্থ)

করোনা মাতা এবং অতিমারীর দেবীরা

নন্দিনী সি সেন

"প্রাথমিকভাবে ধর্ম ভয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অংশত এটি অজানার প্রতি ভীতি, এবং অংশত এই অনুভব যে, একজন বড় দাদা গোছের কেউ আছে যে সমস্ত বিপদ ও বিবাদে পাশে আছে। রহস্যময়ের প্রতি ভীতি, পরাজয়ের ভীতি, মৃত্যু-ভীতি। ভয় হচ্ছে নিষ্ঠুরতার জনক এবং এ কারণে, ধর্ম ও নিষ্ঠুরতা যে হাত ধরাধরি করে চলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।" — বার্ট্রান্ড রাসেল

ভারতবর্ষে রোগের প্রতি ভীতি মাতৃস্থানীয়া দেবী-র জন্ম দেয়, যাঁর আরাধনা করলে তিনি নাকি রোগকে বশীভূত করতে পারবেন। তিনি নিরীহ কোনও দেবী নন, বরং ক্রোধোন্মত্ত উগ্র একজন, যাঁকে ভয় করে চলতে হবে এবং সর্বদা সন্তুষ্ট রাখতে হবে।

তিনি একা নন, অনেকজন— যাকে 'আম্মান' বা 'মা' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই বিপদের সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশ্বাসের পাশাপাশি এই মাতৃরূপী দেবীর সৃষ্টি ও আরাধনা করার ইচ্ছাটিও একসঙ্গে চলছে।

যখনই কোনও রোগের সৃষ্টি হয় বা তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, তখনই এমন দেবীর জন্ম দেওয়া হয়। তাই এখনকার এই কোভিড-১৯-এর আবহে 'করোনা-মাতা'-কে দেবী হিসেবে যেভাবে পুজো করা হচ্ছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

অতিমারীর সময়ে বহুকাল ধরেই এমনই অনেক দেবীর সৃষ্টি করা হয়েছে যাকে ঐ বিশেষ রোগের নামে চিহ্নিত করা যায়। এরা হিন্দু শাস্ত্রে জীবন্ত দেবী হিসেবে পরিগণিত হয়, এরা একদিকে যেমন ভয়-ভীতির উদ্রেক করে অন্যদিকে তেমনি গভীর বিপদের সময় রক্ষাও করে।

মা শীতলা — এমনই এক জাগ্রত দেবী হচ্ছেন গুটিবসন্তের দেবী শীতলা মাতা, যিনি সুরক্ষা ও পুত্রসন্তান পাওয়া— উভয় উদ্দেশ্যেই পূজিত হন। বিশ্বাস করা হয় যে, এঁর পুজো করলে বাচ্চাদের গুটিবসন্ত হবে না। শীতলা হচ্ছেন দেবী দুর্গার উত্তরভারতীয় সংস্করণ, যিনি বসন্ত, ঘা, ফোঁড়া, ভূতপ্রেত ও নানা রোগের উপশম ঘটান।

এই দেবীর গল্পটা খুব সহজ— ইনি জ্বরাসুর অর্থাৎ জ্বরের অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। জ্বরাসুর যেখানে যেখানে গেছে, ঐ সব জায়গায় ইনি তাঁর গাধায় চড়ে পৌঁছে যান, ঝাঁটাপেটা করে তাকে ময়দা বানিয়ে দেন আর ঠাণ্ডা জল ('শীতল' কথাটার অর্থই তো ঠাণ্ডা) ও ভেজা নিমপাতা জ্বরাক্রান্ত শিশুর কপালে বুলিয়ে তাকে সুস্থ করেন।

তাঁর আরাধনার একটি চিত্তাকর্ষক দিক হল, ভর হওয়াকে রোগের বিরুদ্ধে টিকা-র মতো ব্যবহার করা। —পুজোআচ্চা করে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে তাঁর 'ভর' করানো হয়। একবার শীতলা মাতা শরীরে ঢুকে গেলে ভাবা হয় ঘরের ভেতরে থাকা নানা ঠাণ্ডা খাদ্যদ্রব্য আর ঘরের বাইরের গান ও নানা আচার অনুষ্ঠানের সাহায্যে তিনি জ্বর-কে কাবু করে ফেলবেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, যুগে যুগে এই দেবীর নানা বিবর্তন। আদিতে নাম ছিল 'হারিতা', পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে নাম হল 'শীতলা' আর দক্ষিণভারতে কলেরার দেবীরূপে 'মারিয়াম্মান',— এইভাবে এই শীতলা দেবীর নানা বিবর্তন ঘটেছে। তবে দেবী শীতলার সবচেয়ে অভিনব উপস্থিতি যথাসম্ভব ব্যাঙ্গালোরের বেপরোয়া যানচলাচলের থেকে রক্ষা করার জন্য ট্রাফিক সার্কল-এ 'আম্মান' হিসেবে উপস্থিতি।

শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স আর অজস্র বহুতল বাড়ি নিয়ে গর্ব করা আধুনিক শহর গুরগাঁও-তে আছে শীতলা দেবীর অত্যন্ত জনপ্রিয়া প্রাচীন একটি মন্দির। বলা হয় তিনশ' বছর আগে জনৈক চৌধুরী সিং রাম-কে দেবী স্বপ্নে দর্শন দেন; তারপর গুরগাঁও-তে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

এর আগে কেশোপুর নামে একটি গ্রামে দেবীর থান ছিল, কিন্তু কোথায় মন্দির হবে তা নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ঝার্সর শাসক বেগম সামরু-র সন্তানকে গুরগাঁওয়ের থান-এ নিয়ে যাওয়ার পর সে নাকি অলৌকিকভাবে গুটিবসন্ত থেকে সেরে ওঠে। এর ফলে দেবীমাহাত্ম্যে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং দেবীই ভয়াবহ

গুটিবসন্তের নিরাময় ঘটাতে পারেন— এ ধরনের দাবির যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে গুরগাঁওয়ের মন্দিরটি স্বীকৃতি পায়। তিনি জমি নিয়ে বিবাদটি দ্রুত স্থায়িভাবে মীমাংসা করে এবং ঘোষণা করেন যে, দেবী গুরগাঁওয়েরই এবং ওখানেই তাঁর পুজো চলবে। এখনো মন্দিরটিতে প্রচুর জনসমাগম হয় এবং ভক্তরা দলে দলে দেবীকে প্রসন্ন করতে জড়ো হন।

ওলা বিবি— বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ ওলা বিবি। বাংলার লোককথার একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ইনি এবং তাঁর বহু থান এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে। বাংলায় প্রথম কলেরা অতিমারী শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এবং ১৮২০ সালের মধ্যে তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। শত সহস্র ভারতীয় আর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দশ হাজার জন এই অতিমারীতে মৃত্যুবরণ করে। এটি চীনেও ছড়িয়ে যায়। আর এই সময়ই ওলাবিবির সৃষ্টি করা হয় এবং আরোগ্যের আশায় তাঁর থানে আরাধনা চলতে থাকে।

ওলাবিবির গানে মুসলিমরা তাঁকে ওলাবিবি বা বিবিমা বলে ডাকেন। এই গানে বলা হয়েছে কিভাবে এক কুমারী যুবতী রাজকন্য ানিরুদ্দেশ হওয়ার পর দেবীরূপে আবির্ভূতা হন। অন্যদিকে হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে, ওলাবিবি হচ্ছেন স্থপতি হিসেবে বিখ্যাত দানব, মায়াসুরের স্ত্রী। হস্তিনাপুরের রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময় পাণ্ডবেরা এই মায়াসুরের সাহায্য নিয়েছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে।

বাংলায় কলেরাকে বলা হয় ওলাউঠা, আর এ থেকেই এর রক্ষাকর্ত্রী দেবীর এই নাম। ভয়াবহ এই রোগটির নিরাময় করা আর রোগীকে বাঁচানোর জন্য তাঁর হস্তক্ষেপ ও আশীর্বাদ কামনা করা হয়। ওলাবিবি তথা দেবীর আরাধনার মধ্যে ঐতিহ্যের যৌথ অংশীদারিত্বের দিকটি প্রতিফলিত হয়, কারণ একই থানে দুই ধর্মের মানুষই পূজাআচ্চা করেন। বাংলায় মুসলিমদের কাছে তিনি ওলা বিবি, হিন্দুদের কাছে ওলাইচণ্ডী। ডেভিড আর্নল্ড জানিয়েছেন, ১৮১৭-এর আগে শীতলা-র চেয়ে এই দেবী অনেক কম জনপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু ১৮১৭-র অতিমারীর পর জনসাধারণের জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা অনেক বৃদ্ধি পায়।

উনবিংশ শতাব্দীর কলেরা প্রাদুর্ভাবের চেয়ে, এই একবিংশ শতাব্দীর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। অতিমারীর বর্তমান আবহে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও সর্বকালের মধ্যে সর্বাধিক। সংখ্যাগুরু রাজনীতির উগ্র বিতর্ক সত্ত্বেও, বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের যৌথ সাংস্কৃতিক বন্ধন এখনও বর্তমান, যার পরিচয় পাওয়া যায় ওলা দেবী বা বিবি-র পূজায় নতুন করে ভক্তি প্রদর্শনের মধ্যে।

এইডস আম্মা— এইচ আইভি এইডস (হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসের সংক্রমণ)-কে অনেকেই আন্তর্জাতিক অতিমারী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। অবশ্য এখন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু) একে আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন। গত আশির দশকে ও নব্বই দশকের শুরুর দিকে এইচ আইভি ও এইডস সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটায়। এখন অব্দি প্রায় সাত কোটিরও বেশি মানুষ এইচ আইভি-তে সংক্রমিত এবং অতিমারীর শুরু থেকে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ এ রোগে মারা গেছেন। এই ভাইরাস রক্ত, বীর্য, যোনি-রস, পায়ু-রস ও বুকের দুধের মাধ্যমে ছড়ায়।

গত নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি যখন ভারতে এইডস প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন এই অতিমারীর কারণ ও বিস্তারকে ঘিরে ভুলভাল তথ্য ও আতঙ্ক ছড়ানোর ব্যাপারটিও প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯৯৭-এর ১ ডিসেম্বর, বিশ্ব এইডস দিবসে, মহীশূরের মেনাসি ক্যাথানাহাল্লি গ্রামের এক স্কুল শিক্ষক এলাকার একটি পাথরের থামে, পরস্পরের দিকে পেছন ফেরা পিঠে পিঠ লাগানো একটি ছেলে ও মেয়ের সাদাকালো অবয়ব এঁকেছিলেন। তিনি তখন জানতেনই না যে, এর ফলশ্রুতিতে ওখানে এইডস দেবীর জন্য উৎসর্গ করা 'এইডস আম্মা'-র একটি মন্দির গড়ে উঠবে। হাইরোডের ধারে পাথরের ঐ মাইলস্টোনটি হয়ে উঠল এইডস-এর দেবী; ইংরেজি ও কন্নড় ভাষায় অসুরক্ষিত যৌনতার ব্যাপারে সতর্কবার্তা ওখানে লেখা হয়েছিল।

এখন ওখানে মন্দির গড়ে উঠেছে; এইডস-আক্রান্ত ব্যক্তিরা ওখানে পুজোআচ্চা করেন। তাঁরা দ্রুত নিরাময় এবং মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য প্রার্থনা করেন। রোগটি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার প্রচেষ্টা হিসেবে যা এক সময় শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে, তা এক আম্মা বা মাতৃরূপে দেবীতে রূপান্তরিত হয়। আর স্থানটি হয়ে ওঠে রোগটিকে দূর করার জন্য মন্ত্র-পূজা-পাঠ অনুষ্ঠানাদি করে প্রার্থনা করার স্থল।

করোনা মাতা — এখন বিশ্বজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কোভিড-১৯; এই অতিমারীতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আর এর ফলে পৃথিবী জুড়ে হয়েছে লকডাউন।

শহর আর ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ। অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। এর টিকা এখনও প্রাথমিক স্তরে থাকার জন্য, এই ভাইরাসের প্রতি আতঙ্ক তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এই আতঙ্কের সুযোগে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী আর রাজনৈতিক নেতারা সমানভাবে এর নিরাময়ের নানা হাবিজাবি নিদান দিয়ে চলেছেন। আর এই ভীতির ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে একেবারে টাটকা 'করোনা মাতা'— সঙ্গে তার তুষ্টিসাধনের নানা চেষ্টা। সংক্রমণ আটকানোর জন্য যখন অন্য দেবস্থানগুলি বন্ধ করা হয়েছে, তখন ঝাড়খণ্ড, আসাম, বিহার ও বাংলার নানা স্থানে করোনা দেবীর পূজা-প্রার্থনার আয়োজন করা হচ্ছে। এখনও অব্দি এই দেবী তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত, কিন্তু রোগটির এই ভয়াবহ প্রকোপ যদি চলতেই থাকে, আর তার নিরাময় যদি সুদূর পরাহত হয়, তবে শিগগিরিই তার অবস্থান স্থায়ি হবে।

এইসব অঞ্চলে পুরোহিত ও মহিলারা মিলে, ঘিয়ের মিষ্টি, ধূপ-ধুনো, ফুল, লবঙ্গ এসব নিয়ে করোনা মাই-এর আরাধনা আর তার রক্তপিপাসা মেটানোর জন্য ক্রিয়াকর্ম শুরু করেছেন। বিশ্বাস— এসব মাটিতে পুঁতে দিলে দেবী তাঁদের পরিবারকে রোগটি থেকে বাঁচাবেন, এই মায়ের পুজোর বাড়বাড়ন্ত হওয়ার সাথে সাথে টুইটার ও অন্যান্য সমাজমাধ্যমে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে চলার আভাস যেমন পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি ব্যাপারটি নিয়ে হাসিঠাট্টাও শুরু হয়েছে। টুইটার-এ '# করোনামাঈ' ও '#সুপারস্টিশান' যেমন চালু হয়েছে, তেমনি কিছু ভক্ত যেভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার সতর্কতা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করছে তার বিরুদ্ধেও লড়াই চলছে।

অন্যদিকে দুর্গার মতো দেবী অর্থাৎ করোনাভাইরাসমর্দিনী করোনাভাইরাস-এর অসুরকে বধ করছেন,— এভাবেও এই দেবীকে জনপ্রিয় করা হয়েছে। ভারতমাতার জাতীয়তাবাদী রূপের সঙ্গে মিলিয়ে 'করোনামর্দিনী'-কে শিল্পী সন্ধ্যা কুমারী আবার ভাইরাস বধের সময় তাঁর মুখে মাস্ক পরিয়ে দিয়েছেন। দেবীকে দেখা যাচ্ছে গ্লাভস পরতে, আর তাঁর হাতে আছে মাস্ক, স্যানিটাইজার ও অন্যান্য চিকিৎসাসামগ্রী; এইভাবে ব্যাপারটি বেশ একটি 'জনস্বার্থবাহী' বিজ্ঞাপন হিসেবে বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছে। করোনা-বধে রত ভারতমাতা-র এই রূপে, করোনা হচ্ছে অসুর, দেবী নয়। এইভাবে চরিত্রেরও বদল ঘটেছে—সর্বশক্তিময়ী দেবী করোনাকে নিধন করছেন।

অতিমারীর এই বাড়বাড়ন্ত চলতে থাকায় করোনা দেবী-র উপর বিশ্বাসও বেড়ে চলারই সম্ভাবনা। আরো ক্ষতি না করে মানুষকে মুক্তি না দেওয়া অব্দি তাঁকে শান্ত করার কাজ চালিয়েই যাওয়া হবে।

যখন পুরুষ দেবতারা ভয়ংকর ঐ দানব মহিষাসুরকে মারতে ব্যর্থ হল, তখন তারা নিজেদের সব অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দেবী-দুর্গার সৃষ্টি করেছিল। বলা হয়, বেশি বেশি করে অস্ত্রধারণ করার জন্য তাঁর হাতে সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল, আর এইভাবে তিনি অবশেষে ঐ দুষ্ট দানব মহিষাসুরকে বধ করতে পেরেছিলেন।

রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার আগে, রামচন্দ্রও দেবীদুর্গার কাছে তাঁর পক্ষ অবলম্বন করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এই অতিমারীর আবহে মানুষও রোগটিকে দেবী হিসেবে পুজো করে তাঁর করুণা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে।

ভাষান্তর : ভবানীপ্রসাদসাহু

সূত্র : থট অ্যান্ড অ্যাকশান

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১

উমা

জম্মু-কাশ্মীরের-এর ৬৮৩টা প্রাকৃতিক জলের উৎস শুকিয়ে গেছে

খবরে প্রকাশ ১৯৯৮-তে যেখানে নদী ও পুকুরের সংখ্যা ছিল ১২৪৮ সাম্প্রতিক উপগ্রহ থেকে নেওয়া ছবিতে দেখা গেছে সেই সংখ্যা থেকে ৬৮৩টার আর কোনও অস্তিত্ব নেই—শুকিয়ে গেছে। সরকারিভাবে এরকম উদ্বেগজনক খবর প্রকাশ করা হয়েছে। এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে লাগামছাড়া উন্নয়নকে। পরিবেশ ধ্বংস করে এমন উন্নয়ন মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ২০১২-তে ওয়াটার রেগুলেটরি অথরিটি স্থাপিত হয়। জলসম্পদ রক্ষার জন্য ২০১৬-১৭তে নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তার বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ হয় নি। ইজরাইল-এর মতো দেশ জলসম্পদ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য কাজ করে যে সাফল্য লাভ করেছে তা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে বটে কিন্তু বাস্তবে তা প্রয়োগ করার সদিচ্ছা না থাকার ফলে আমাদের দেশ আজ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি।

সূত্র — দ্য স্টেটসম্যান ১৪/০৪/২০২১

সাদা মন কালো মন : প্রেজুডিস্ বনাম বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি

রূপক বর্ধন রায়

"পাশ্চাত্য সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা আমাদের অন্তরের দৈন্য ও দুর্দশার প্রকৃত মূর্তি বুঝিতে আমাকে সাহায্য করিয়াছে। ...পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত একাসনে বসিবার স্থান পাইতে হইলে সমাজদেহের ক্ষতগুলির উপর অস্ত্রোপচার করিতে হইবে। ইহাতে যে বেদনা বোধ হইবে তাহা স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।..."

২০১৮ সালের জার্মানির ড্রেসডেন শহরে 'নিও-নাজি'-দের হাতে হেনস্থা হওয়া ইস্তক, এবং তা ছাড়াও বিগত দশকে গবেষণার কাজের চরকিপাকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ইতিউতি ছড়িয়ে থাকা নানান সামাজিক ব্যাধি বারংবার নিজের ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ায়; আজ এই পঁয়ত্রিশের কোঠায় এসে প্রশ্ন জাগে— বিশ্বায়নের এই যুগে এসেও এমন পৃথিবীতে তবে টেকনোলজি তথা প্রায়োগিক দিক ছাড়া বিজ্ঞান ও সায়েন্টিফিক টেম্পারের জায়গা কোথায়? তবে তাদেরই মধ্যে এক আধটা 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিদীপ্ত' দেশ দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তার থেকেও জরুরি যে প্রশ্নটা মনে আসে তা হল— মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অগ্রসর সে দেশগুলোর তুলনায় দেশ হিসাবে, রাজ্য হিসাবে, শহর হিসাবে আমাদের অবস্থান কোথায়? কেবল ড্রেসডেনের মতো বর্ণবৈষম্যের কথাই যদি ধরি তবে কয়েক হাজার বছরের বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা আমার ভারতবর্ষে আজও ভোটের প্রচারে সাদা চামড়া কালো চামড়ার উপর ভিত্তি করে মিম তৈরি হয় কেন? কোথায় সেই সামাজিক ব্যাধির মূল, কি তার ঐতিহাসিক ভিত্তি? কাজেই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু-একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া জরুরি। হাজার বছরের ইতিহাসে যখন আমাদের সামাজিক ব্যাধি সমূহের নিবৃত্তির হার শতাংশের হিসাবে ভগ্নাংশেও পৌঁছয় না তখন এই কথা বলার মাধ্যমে সে কাজ আজই সম্ভবপর হবে তেমন কথা ভাবারও দুঃসাহস এ প্রবন্ধের নেই। তবে 'সোশ্যাল মিডিয়া'-এ 'হ্যামারিং' তো বন্ধ করা চলে না। এ পোড়া দেশে হাতে গোনা অগ্রজরা সে কাজটা নিজের জীবিতাবস্থায় প্রতিকূল তরঙ্গের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নির্ভীক চিত্তে করে এসেছেন আজ তাদের গলায় বরমাল্য দেওয়ার মুরদ না থাকতে পারে তবে সংকুচিত বৃত্তে হলেও সে কাজ বন্ধ করে তাদের অপমান করার স্পর্ধা আমার নেই। কারণ এই অপ্রেম এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিহীনতার দিনে শান্তির খোঁজে বার বার তাদের কাছেই ফিরে যেতে হয়। দিনের শেষে দুটো পাতা উল্টে তবে ঘুম আসে। সে লেখার সাথে সকলে একমত হতে না পারলেও কোন দিকে আমার অবস্থান সে দিক নির্দেশ করে সে সব প্রবন্ধ। এবছর কলকাতায় গিয়ে সঞ্জয়দার সাথে আড্ডায় শুনেছি কলকাতা তথা বঙ্গের নামজাদা প্রকাশনা সংস্থাগুলিতে তন্ত্র ও তান্ত্রিক ভিত্তিক গোয়েন্দা উপন্যাসের বিক্রির আজ বাড়বাড়ন্ত। বাঙালির পোড়া কপাল; বিগত পঞ্চাশ বছরে তৈরি হওয়া সাহিত্যের শপিং মলে বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রায় সম্পূর্ণই ব্রাত্য হয়েছে। তবু তো জহুরি চোখ পরশপাথর খোঁজে। তার জিজ্ঞাসু মন একাই সাগরতলে মুক্তো খুঁজে বেড়ায়। তেমন জহুরির কাছে যদি সে রত্নভাণ্ডারের ছিটেফোঁটাও পৌঁছে দিতে পারি তবে খানিকটা হলেও এ নিবন্ধ সার্থক। তাছাড়া শুরুতেই যে কথার উদ্রেক করেছি সে প্রশ্নের উত্তর খানিকটা হলেও খোঁজার চেষ্টা করব। সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা আমাদের বঙ্গদেশের মতো সুবৃহৎ হলে তার ব্যাধির ব্যাপ্তিও বিরাট। এই এক নিবন্ধে তার সমস্তটাকে সাবাড় করা অসম্ভব। তাই মূলত ভারত তথা আধুনিক বঙ্গ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ চামড়ার রঙ ভিত্তিক বর্ণবৈষম্যের ঐতিহাসিক মূল্যায়নের মাধ্যমেই নিজের কথা বলার চেষ্টা করব।

অতএব আসুন, এই চর্বিত চর্বণের ইতি টানা যাক, বরং মূল কথায় আসি।

"...শতাব্দীর পর শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অনাচারের নাগপাশে সমাজদেহ অসাড় হইয়া গিয়াছে।..."

ভারতবর্ষের সামাজিক বিভাজনের ইতিহাস বহু পুরনো, বহু সহস্রাব্দ প্রাচীন তার ভিত্তি। ঋকবেদের অন্তর্ভুক্ত বহুল-আলোচিত 'পুরুষসুক্ত' তত্ত্বে বলা হয় যে 'পুরুষ' (যিনি মানব পুরাণের আদিমতম অস্তিত্ব, লিঙ্গ ভিত্তিক পুরুষ নন) এই সামাজিক ক্রম বা ভাগগুলি তৈরি করবার উদ্দেশ্যে

নিজেই নিজেকে বিনষ্ট করেন। ফলত তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চারটি সামাজিক বিভাগের জন্ম হয়। মাথা থেকে ব্রাহ্মণ, দুই বাহু বা হাত থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং সবশেষে পায়ের পাতা থেকে শূদ্রের জন্ম তার। এই গোটা কাহিনীটির মধ্যে অন্তর্নিহিত অকথ্য পুরুষতন্ত্রের কথা যদি আমরা তর্কের খাতিরে আপাতত দৃষ্টি অগোচর করেও যাই, দিব্যি বোঝায় যায় যে উপরোক্ত সামাজিক ক্রম সৃষ্টির আদিরহস্যে বর্ণবৈষম্যের উপস্থিতি নেই। নির্মলকুমার বসু তাঁর 'মহাত্মা গান্ধীর বর্ণাশ্রম এবং কমিউনিজম' প্রবন্ধে যেমন গান্ধীকে অনুবাদ করে লেখেন— '...সমাজে জন্মের দ্বারা লোকের বৃত্তি নিরূপণ করা হইত এবং রাজার কাজ ছিল তিনি প্রজাগণের মধ্যে বৃত্তিভেদ ঘটিতে দিবেন না, অর্থাৎ কোনও রকম বর্ণসঙ্কর হইতে দিবেন না...'

তবে একথা সত্যি যে তৎকালীন সমাজে আগত আর্য অধিবাসীরা ভারতীয় অধিবাসীদের তুলনায় শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। বৈদিক সাহিত্যে এই আদিবাসীদের বারংবার 'দস্যু' অথবা 'দাস' নামেই অবহিত হতে দেখা যায়। এই দুই দল, অর্থাৎ, আগত আর্য এবং আদিবাসিন্দাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি, লড়াই, কোন্দল লেগেই থাকত, এবং ইতিহাসে সেই দুই দলকে আলাদা করে বোঝানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের চামড়ার রঙের উপরেই নির্ভর করা হয়েছে। কিন্তু অন্য দিকে এই কথিত যুদ্ধ বা কোন্দলের কারণ হিসাবে, প্রায় সবক্ষেত্রেই জমি-জমা, ধন-দৌলতে বা পারতপক্ষে গবাদি পশুর ধর্মগ্রন্থে একাধিক কৃষ্ণাঙ্গ দেব, দেবী এবং বিখ্যাত মানব-মানবীর নামের উল্লেখও লক্ষ্য করা যায়। 'কৃষ্ণ', 'কাহ্ন', 'দীর্ঘতমা' ছাড়াও আজকের ভারতীয় রাজনৈতিক ভূচিত্রে বহু আলোচিত 'রাম'তো রয়েইছেন। বেদ পরবর্তী সময়ে মোগল আমল অবধি ঐতিহাসিক পর্যায়গুলিতেও, ভারতীয় সামাজিক আবর্তে বর্ণবৈষম্যের উল্লেখ নেই বললেও চলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এও মনে রাখা প্রয়োজন যে আরব, মুঘল এবং অন্যান্য মুসলমান হানাদারদের আঞ্চলিক ব্যুৎপত্তির ভিত্তি কিন্তু শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত তুরস্ক, পারস্য এবং আরব্য অঞ্চলে।কিন্তু মুঘল আমল পেরিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তার হাত ধরে আগত ব্রিটিশ রাজের ইতিহাস ঘাঁটতে শুরু করলেই প্রমাদ ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমসাময়িককালে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিদের তুলনায় নিজেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রত্যয় ব্রিটিশদের এই ধারণায় উপনীত করে যে, তাদের তুলনায় খর্বকায়, শ্যামবর্ণ যে কোনো জাতি বা দেশকে যথেচ্ছ দমন-নিপীড়ন করবার জন্মগত অধিকার তাদের রয়েছে। ফলবশত, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম লাগু হল। ব্রিটিশ রাজের ইতিহাস ঘাঁটলে যে এমন ঘটনার উল্লেখ বহুবার পাওয়া যাবে একথা আমাদের কারোরই অজানা নয়। ব্রিটিশদের হাতে তৈরি হওয়া বেশিরভাগ রেঁস্তোরা বা দোকানপাটে লেখা থাকত 'ইন্ডিয়ানস্ অ্যান্ড ডগস্ আর নট অ্যালাউড'। তাছাড়া নানান শারীরিক খাটুনি ও যুদ্ধের সেনানীর কাজে বেশ কিছু মানুষের প্রয়োজন পড়লে, সেই কাজে মূলত কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়রাই নিয়োজিত হতেন। অফিসগুলোর আরাম কেদারায় জায়গা পেতেন তুলনায় ফর্সা বা পরিষ্কার ত্বকের বাবুরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সেই ভয়ঙ্কর কথাটি তো সর্বজনবিদিত, যেখানে উনি লিখছেন, 'আই হেট ইন্ডিয়ানস্। দে আর এ বিস্টলি পিপল উইথ এ বিস্টলি রিলিজিয়ান'। অথবা কিপলিং-এর সেই কুখ্যাত উদ্ধৃতি — 'ইংলিশ মেন আর ইউনিকলি ফিটেড টু রুল লেসার ব্রিডস্ ইউথ আউট ল' কেই বা ভুলতে পারে?

"এই তথাকথিত 'সাহেবি' সভ্যতার ... অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, ইহা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত..."

কাজেই প্রায় ২০০ বছর ধরে চলতে থাকা এই বিচ্ছিন্নতাবাদী বর্ণবৈষম্য ধীরে ধীরে মানুষের মনস্তত্ত্বকে বিকৃত করতে শুরু করে। সাধারণ ভারতবাসীর মনে এই ধারণার জন্ম হয় যে কেবল মাত্র সাদা বা শুভ্র ত্বকই ধন, দৌলত, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অনুষঙ্গ। মানব মনস্তত্ত্ব বিকৃতির এই পর্যায়ের কোনো এক সন্ধিক্ষণেই আমরা আমাদের অজান্তেই মনে মনে সাদা চামড়ার এই সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক আধিপত্যকে মেনে নিয়েছি এবং স্বাধীনতার সাত দশক পরেও সেই তথাকথিত ফর্সা চামড়াই আমাদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। ভারতবর্ষের বর্ণবৈষম্য সমস্যার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা যতটা জরুরি, সেই সঙ্গে এ সমস্যার সামাজিক-মনস্তত্ত্বের দিকটিও আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই আলোচনা করতে হবে। আমি আমার বন্ধুবান্ধব ও পারিবারিক বৃত্তে একাধিক মানুষকে বলতে শুনেছি যে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ নন বরং 'উজ্জ্বল বাদামি'। এই মনস্তত্ত্বের সাথে আমাদের দেশের বহু শতাব্দী প্রাচীন জাত-ভিত্তিক বিভাজন এবং আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক বিবর্তনের সোজাসুজি যোগাযোগ রয়েছে। সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে যে জাত বা কাস্ট প্রথার জন্ম, সেই

কর্মভিত্তিক বিভাজনকে ব্রিটিশ রাজ বর্ণবৈষম্যের ছাঁচে ফেলে নিজের সুবিধার্থে কাজে লাগিয়েছিল। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে ব্রিটিশ শাসনকালের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও অর্থনৈতিক দিক থেকে তুলনামূলকভাবে দুর্বল মানুষেরাই রোদে পুড়ে জলে ভিজে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের দেশের কায়িক শ্রমের কাজগুলো করে চলেছেন। এবং সে কারণেই তাদের চামড়ার রঙ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্যামবর্ণ (প্রসঙ্গ মেলানিন পিগমেন্ট)। আমাদের দেশের এই 'অর্থনীতিজাত ত্বক' ভিত্তিক অস্তস্তিকর দুষ্ট চক্র বা ভিশাস সাইকেলের ২০০-৩০০ বছরের সামাজিক বিবর্তন নানান কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিয়ম ও প্রবাদ-প্রবচনের জন্মও দিয়ে চলেছে। উত্তর ভারতে প্রচলিত এই প্রবাদটি তার বিশেষ উদাহরণ— 'একজন শ্বেতবর্ণ দলিত বা একজন শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না।' সিডনি স্মিথ যেমন বলেছিলেন, 'পভার্টি ইজ ইনফেমাস'। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশরাজ সমসাময়িক বঙ্গসমাজের উল্লেখ না করলেই নয়। 'চোখের বালি' মনে পড়ে? রেশমের ফিরিঙ্গি ব্লাউজে ন্যাপথালিন রাখার কথায় হাসতে হাসতে মহেন্দ্র যখন আশাকে বলেন, 'অমন সোনার বরণ বউকে যদি পোকায় কেটে দেয়'? সে কথায় তদানীন্তন বাঙালি সমাজের ফিরিঙ্গি প্ররোচিত বর্ণবৈষম্যের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ কি কবিবর করে যাননি? বউ শ্যামবর্ণা হলে এই প্রেম কতদূর টিকত সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে! এই প্রসঙ্গে বর্তমানের দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ২০১৪ সালে নিজেরই পরিবারের ক্রমাগত অসহ্য মানসিক নির্যাতনে বিরক্ত হয়ে ব্রততী দাস নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হন। অত্যাচারের কারণ, ব্রততী ছিলেন শ্যামবর্ণা। ২০১৫ সালে দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে আরেকটি ঘটনা প্রকাশিত হয়। এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে ২৫ বছর বয়সী তরুণী তার গোটা পরিবারকে খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যার প্রচেষ্টা চালান। ৫ জনের মৃত্যু হয় এবং আরো একাধিককে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। প্রায় একই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যখন লেখেন, 'চৌরঙ্গীতে থাকিতে হইবে অর্থাৎ আমি যাহা নই তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে'— তখন সে কথা সমসাময়িক মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজ কর্তৃক প্রবর্তিত 'সাহেবিয়ানা'র উদাহরণ মাত্র, যার মূল— সেই শুভ্র ত্বক ও প্রতিপত্তির একাত্ম অনুষঙ্গ। এর থেকেও বড় সমস্যা— একবিংশ শতাব্দীতেও কলকাতা শহরের বুকে সেই 'কলোনিয়াল হ্যাংওভার' দিব্যি বেঁচেবর্তে রয়েছে। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ স্কুলে বাংলা ভাষা ব্রাত্য করা থেকে শুরু করে (যেখানে ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজি পড়ানো বেশি পয়সা রোজগারের সমার্থক), ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির অথবা ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসামের মতো ক্রিমের যথেচ্ছ ব্যবহার ইত্যাদি।

হায়, সায়েন্টিফিক টেম্পার!

"...দেশের যে এখন ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে, ইহা ... উপলব্ধি করিতে বাকি নাই। এই বোধই আমাদিগকে প্রকৃত পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত করিবে...অপ্রিয় আলোচনা বন্ধ রাখিলে রোগ সারিবে না।..."

এখন প্রশ্ন হল, তবে উপায়? এ ব্যাধির নিরাময় কোথায়? আমাদের সৌভাগ্য সে উত্তর নিজে খুঁজে বের করতে হবে না। এ লেখার মোড়ে মোড়ে যে অগ্রজদের স্মরণ করেছি তাঁরাই তাঁদের বক্তব্যের পরতে পরতে সেই রাস্তাই দেখিয়ে গেছেন। দরকার স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে প্রাথমিক বিজ্ঞানের চর্চা, যা বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারে সহায়ক হবে। আর প্রয়োজন প্রশ্ন করতে শেখানো, তাই আজ বিশেষ প্রয়োজন শিক্ষার সাথে মূল্যবোধের অনুশীলন। তেমন পড়াশোনাই সায়েন্টিফিক টেম্পার বা রাজশেখর বসুর ভাষায় 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি'র আতুরঘর। কারণ, সায়েন্টিফিক টেম্পার ইটসেলফ ইজ দি থিন লাইন বিটুইন রিগ্রেশান অ্যান্ড মডার্নিজম। যে রিগ্রেশান বা প্রত্যাবৃত্তির কথা বলছি সে নিজে রোগ নয় রোগের উপশম মাত্র, আসল রোগের মূলে রয়েছে পক্ষপাতমূলক কুসংস্কার বা প্রেজুডিস। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাঁর 'সভ্যতা ও বিজ্ঞানের শক্তি' লেখাটিতে যেমন বলছেন— 'আমরা যাহা কিছু করি বা ভাবি, একটা বদ্ধমূল ধারণা হইতে তার উদ্ভব হয়।... কেহ বলেন আমাদিগকে সেই প্রাচীন অর্বাচীন যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাহা কি সম্ভব ও যুক্তিসঙ্গত?...।' কেবলমাত্র বর্ণবৈষম্য সমস্যার ক্ষেত্রেও আমরা সেই দৃষ্টান্ত পাই, যেখানে দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনকালের ত্বকভিত্তিক বিভাজনের রাজনীতি আমাদের 'সোস্যাল মিডিয়া' সাদার সাথে স্বচ্ছলতা ও কালোর সাথে অভাবকে সংযুক্ত করবার প্রেজুডিসকে আমাদের অজান্তেই অনুবিদ্ধ করেছে। এই যুক্তিহীনতার ক্রস আর্গুমেন্ট হিসাবে সর্বজনবিদিত মেলানিন পিগমেন্ট, সূর্য রশ্মি ও চামড়ার রঙের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কটিকেই আরো ভালোভাবে ভেবে দেখা যেতে পারে। বহু বছর আগে আবিষ্কৃত এই বৈজ্ঞানিক সত্য কিন্তু আজ স্কুলশিক্ষিত সমস্ত মানুষেরই প্রায় জানা। সেই অনুষঙ্গ আরো ভাল করে বুঝতে

হলে আমরা শিম্পাঞ্জি ও গরিলার চামড়ার তুলনামূলক আলোচনায় একবার চোখ রাখতে পারি। যেহেতু শিম্পাঞ্জিরা গাছের ডালে ঝুলে ফলমূল খেয়ে তাদের জীবন যাপন করে তাই গাছের ছায়াতেই তাদের বসবাস। কাজেই সূর্যরশ্মির সরাসরি প্রভাব তাদের চামড়ায় নেই বললেই চলে। অন্যদিকে গরিলা প্রজাতির যাপন ও ভোজন জঙ্গলের সমতলভূমির মাঝে, যাকে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় 'স্যালাড বেসিন' বলে থাকি। সে কারণেই গরিলাদের চামড়ার উপর আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশি প্রভাবশালী। কাজেই এই দুই পশুর লোম সরিয়ে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে, শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে চামড়ার রঙ গোলাপি আর অন্যদিকে গরিলার ক্ষেত্রে তা মিশকালো। কাজেই মানুষের ক্ষেত্রে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে পৃথিবী জোড়া এই বর্ণভিত্তিক বিভাজন প্রথার কোনো সামাজিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আমাদের চামড়ার রঙ মূলত একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অর্থাৎ আমাদের পূর্বসুরীদের জীবনযাপন ও বসবাসের আবহাওয়ার ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রকৃতিকেই প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। এছাড়া মেলানিন পিগমেন্টের সংখ্যা ও মানের ব্যাখ্যাকে ব্যবহার করে আমাদের শরীরের নানান গুণ ও সমস্যার দিককে জেনেটিক মাপদণ্ডে তুল্যমূল্য বিচারও করা সম্ভব।

এই কথাগুলো ভাবতে হলে স্বল্প পড়াশোনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, তবে তার থেকেও বেশি প্রয়োজন বিজ্ঞান মনস্কতা ও যৌক্তিক ভাবনার অনুশীলন। গদ্যরাজ রাজশেখর বসু তাঁর 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' প্রবন্ধে বলেন—

''...জগতের শিক্ষিত জন যদি সকল ক্ষেত্রে এই প্রকার উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখেন তবে কেবল সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার দূর হবে না, ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিক সংঘর্ষেরও অবসান হবে।...''

হে সর্বজ্ঞ পাঠক পরিশেষে এই কথাই বলি যে— 'সায়েন্টিফিক মেকানিকাল ব্রেইন' নিজেই যখন একথা আমাদের জন্য লিখে রেখে গেছেন তখন এরপর আমার আর বিশেষ কিছু বলার থাকে না। কাজেই আমার কথাটি ফুরলো।

নিবন্ধের এক একটি পরিচ্ছদের আগে ব্যবহৃত কোটেশানগুলি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিরচিত মাসিক বসুমতী (শ্রাবণ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় প্রকাশিত 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

উমা

পর্ব ৪

স্বচিকিৎসা — হঠাৎ অজ্ঞান

গৌতম মিস্ত্রী

হঠাৎ অজ্ঞান হলে কী করণীয় — হঠাৎ কেউ যদি অজ্ঞান হয়ে যায় তখন সেই ব্যক্তির বড় একটা কিছু করার থাকে না। জ্ঞান ফিরলে তিনি চিকিৎসকের কাছে যাবেন পরামর্শের জন্য— এটা না বললেও চলে। তার পরের অধ্যায়টায় সাধারণ মানুষের কিছু করার নেই, সেটা চিকিৎসা প্রকৌশলের জটিল বিষয়। সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। জ্ঞান ফিরে পাওয়া মানুষটির চিকিৎসা দরকার দুটো কারণে— ১) তার শরীরে কোনও সুপ্ত রোগের লক্ষণ হিসাবে তিনি অজ্ঞান হলেন কিনা সেটা নির্ণয় করা, ২) ভবিষ্যতে তার পুনরায় অজ্ঞান হওয়া রোধ করা।

আমাদের চারপাশে কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ সেই জ্ঞানহারা মানুষটির চারপাশের মানুষের কাছে সেটা মোটেই সৌভাগ্যের বিষয় নয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অচেনা মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয় হতভাগ্য সদ্য জ্ঞান হারানো মানুষটির। এমন ক্ষেত্রে গোবেচারা দর্শকের একটা দায় থেকেই যায়, সেটা তাঁর যতই অপছন্দের হোক না কেন। অজ্ঞান হওয়া মানুষের চারপাশের মানুষের কী করা উচিত সেটাই আমাদের এবারের আলোচ্য বিষয়।

সদ্য জ্ঞান হারানো মানুষটি আমরা আপনার অপরিচিত হতেই পারে— অর্থাৎ ধরে নিচ্ছি অজ্ঞান হয়ে আপনার সামনে যে মানুষটি মাটিতে পড়ে আছেন তার নাম-ধাম যেমন না জানতে পারেন, তেমন তার কোনও অসুস্থতা আগের থেকেই ছিল কিনা সেটাও আপনার অজানা থাকাই স্বাভাবিক। সচেতন ও সামাজিক জীব হিসাবে আপনার সামনে জ্ঞান হারানো মানুষটিকে সাহায্য করার জন্য আপনার কয়েকটি বিষয়ে সক্রিয় হতে হয়, কারণ না হয়ে পারা যায় না। আবার সেই সক্রিয়তার খুঁটিনাটি আপনার চারপাশের মানুষজন, চেনা-আধচেনা মানুষদেরও জানানো প্রয়োজন। কারণ, ভবিষ্যতে আপনি ঘটনাচক্রে ওইরকম অজ্ঞান হয়ে পড়লে আপনারও এমন চারপাশের অচেনা মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।

অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া মানুষটির সাহায্যের জন্য তাকে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবার আগে কিছুটা সময় বয়েই যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবার আগেই অজ্ঞান মানুষের জ্ঞান ফিরে আসে— তার পক্ষে দুর্ঘটনার কথা কিছুই মনে থাকে না। কারণ সেই কুসময়ে তিনি তো অজ্ঞান। কিন্তু চিকিৎসককে দুর্ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রোগীর রোগ নির্ণয়ে প্রচুর সাহায্য করে— দামী পরীক্ষা নিরীক্ষাও সেই পরিমাণে নিঃসংশয় তথ্য জোগাতে পারে না। জ্ঞান হারানো রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের কাছে/ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনার সক্রিয় কর্মকাণ্ড অনেক রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পারে। সেই কর্মকাণ্ডের আলোচনা করা যাক, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী— ১) প্রথম প্রশ্ন, উনি সত্যিই পুরোপুরিভাবে অজ্ঞান হয়ে গেছেন, না -আধা অজ্ঞান হয়েছেন? ডাকলে সাড়া না দিলে গলার ভলিউম বাড়িয়ে ডাকাডাকি করুন— তাতে অনেক সময় মাটিতে ধরাশায়ী ব্যক্তি চোখ মেলে তাকাতে পারেন, ইশারায় কিছু বলার চেষ্টা করতে পারেন। তাতেও তিনি নিরুত্তর থাকলে তাকে চিমটি কাটুন, গালে আলতো করে থাপ্পড় মারুন, তার চোখেমুখে জলের ঝাপটা মেরে দেখুন তিনি আদৌ সাড়া দিচ্ছেন কিনা, এই কাজটা চটপট করে ফেলতে হবে— বড়জোর ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ডে। এই সময়ের মধ্যেই বুঝে নিতে হবে সংজ্ঞা হারানো মানুষটি সত্যিই জ্ঞান হারিয়েছেন। ধরাশায়ী মানুষটি গালে থাপ্পড় খেয়ে চোখ মেলে তাকিয়ে আপনাকে মারতে এলে আপনার খুশি হওয়া উচিত। এমনটা হলে সমস্যা মৃদু। সেটা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নয়। পরের অংশে যাওয়ার আগে ধরে নিচ্ছি আপনার চড়-থাপ্পড়ে মাটিতে চোখ বুজে থাকা মানুষটির কোনও হেলদোল নেই। এমনটি হলে একই সঙ্গে দুটো কর্মকাণ্ড একসাথে করতে হবে। আপনার চারপাশে ততক্ষণে জমে যাওয়া মানুষদের সাহায্য নিতে হবে। ২) প্রথমে জ্ঞান হারানো মানুষটির আপৎকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করা অগ্রাধিকার পাবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংজ্ঞালুপ্ত মানুষটি সত্বর জ্ঞান ফিরে পান ও নিজেকে বেকায়দা অবস্থায় দেখে লজ্জিত হয়ে দুপায়ে খাড়া হবার চেষ্টা করেন। তাঁকে কোথাও শোবার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। খুব কম সংখ্যক মানুষ মিনিট খানেকের বেশি সময় ধরে বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন। তাঁদের শীঘ্র হাসপাতালে ভর্তি করানো দরকার। দু-একজন অ্যামবুলেন্স, হাসপাতালের ব্যাপারটা দেখুক, সেই অবসরে অজ্ঞান মানুষটির যত্নআত্তির জন্য কয়েকজন সক্রিয় হোক।

অজ্ঞান মানুষের প্রাথমিক শুশ্রূষা— অজ্ঞান হওয়া মানুষটি যেখানে পড়ে আছেন, সেখানেই শুয়ে থাকতে দিন। জায়গাটায় ধুলো-কাদা আছে বলে কাছেপিঠের বেঞ্চ, চেয়ার, টুল, খাট ইত্যাদি ভদ্রসভ্য শয়নস্থানে স্থানান্তরিত করা কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়, অত্যন্ত ঝুঁকিরও। ঘটনাচক্রে মানুষটির কিছুটা জ্ঞান ফিরলে আধা-জ্ঞান ফেরা মানুষটির জন্য একথা আরও সত্যি। তেমনটি করার সময় কিছুটা সামলে নেওয়া আধা-জ্ঞান ফেরা মানুষটি আপনার 'ঠাঁই বদলের' প্রচেষ্টায় আবার অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারেন। ধুলো কাদায় মানুষ পড়ে গেলে তাঁকে সাফসুতরো হতেই হবে। তার জন্য কোনও তাড়া থাকতে নেই। কেন নেই সেটা সহজে বলতে গেলে বলতে হয়, সমস্যাটা যখন জীবন-মরণের সেখানে কিছুক্ষণ বেকায়দা স্থানে জ্ঞান হারানো মানুষটি শুয়ে থাকলে তাঁর ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আপনার-আমার অন্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার আমার প্রচেষ্টা ছাড়াই মানুষটি নিজের পায়ে খাড়া হয়ে লজ্জায় মাথা নীচু করে আপনার দৃষ্টি সীমানার বাইরে চলে যাবেন। আমিও হয়ত তাই করতাম। কিন্তু আপনার হিরো হওয়ার শখ থাকতে নেই। পুরো ঘটনার সাক্ষী হিসেবে সেই মানুষটির ডাক্তারের অনেক কিছু জানতে হবে। মানুষটিকে আপনার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে দিন। কেন দরকার? নিবন্ধের শেষে সেই আলোচনা করব। তার আগে বেশিক্ষণ ধরে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মানুষের (যদি তেমনটা হয়) শুশ্রূষা দরকার।

মাছের বাজারে, রেশন দোকানের লাইনে অথবা রাস্তায় ধুপ করে একজন মানুষ পড়ে গেলেন আর অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বাপারটা এমন হতে পারে, তিনি হয়ত হোঁচট খেয়ে অথবা মামুলি কারণে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। নতুবা অজ্ঞান হয়েছেন বলেই পড়ে গেলেন। অর্থাৎ পড়ে যাওয়াটা অজ্ঞান হওয়ার কারণ অথবা ফল হতে পারে। পড়ে যাওয়াটা অজ্ঞান হওয়ার ফল হলে তাঁর শীঘ্র চেতনা পাবার উপায় কম। অজ্ঞান হওয়ার ফলে পড়ে গেলে অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে চেতনা ফিরে পেতে সময় লাগে। সেই সময়ে অজ্ঞান ব্যক্তির শুশ্রূষার জন্য তাঁকে সেখানেই, মাছের বাজারের নোংরা কাদামাখা মাটিতেই শুইয়ে রাখতে হবে। তাঁকে উপুড় করে বা পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিতে হবে যাতে মানুষটির মাথা তাঁর শরীরের সবচেয়ে নীচের দিকে থাকে, আর মুখ মাটির দিকে ফেরানো থাকে। কোনও রকমেই যেন তাঁর বমি বা নাক ও মুখ থেকে বেরোনো লালা-কফ তাঁর গলা বেয়ে শরীরে ঢুকতে না পারে। তাঁর চারপাশে থাকা ধারালো দা, বটি, ছুরি, আগুন, কেরোসিনের বাতি ইত্যাদি সরিয়ে ফেলুন। ইতিমধ্যে অবশ্যই কেউ হাসপাতাল, ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্সের বন্দোবস্ত করুক। মানুষটির নাড়ি না পাওয়া গেলে, শ্বাস বন্ধ হয়ে কৃত্রিম হৃদপিণ্ড স্পন্দনের ও ফুসফুসে হাওয়া ঢোকানো (আর্টিফিসিয়াল কার্ডিও রেসপিরেটরি সাপোর্ট) কৌশল জানা মানুষের সাহায্য নিতে হবে যতক্ষণ না মানুষটিকে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের বিছানায় স্থানান্তরিত করা যাচ্ছে।

এবার শেষ কাজটা বাকি। আপনি নিজেকে যথেষ্ট ভরসাযোগ্য মনে না করলে নাড়ির গতি (পালস্ রেট) শ্বাসের গতি (রেস্পিরেটরি রেট) মাপতে পারে এমন কাউকে চিৎকার করে ডেকে নিন— যিনি ওইসব মেপে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। আপনি কয়েকটা তথ্য জেনে নিন। মানুষটি সত্যি পুরো অজ্ঞান না কিছুটা সাড়া দিচ্ছেন। কোনও দ্বিধা না করে মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটির কানে সুড়সুড়ি অথবা আলতো করে গালে থাপ্পড়— তাতেও না হলে গায়ে চিমটি কেটে দেখুন মানুষটির কোনও হেলদোল হয় কিনা। মানুষটি আপনাকে পাল্টা থাপ্পড় মারলে রাগ না করে খুশি হোন কেবল এই জেনে যে আপনি একটা অসহায় মানুষকে যমের দুয়ার থেকে ধরায় ফিরিয়ে আনলেন। সদ্য জ্ঞানপ্রাপ্ত মানুষটি যখন উঠে বসার চেষ্টা করছেন, তাঁকে সেখানে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে অনুরোধ করুন। আর মনে করে রাখুন কয়েকটি বিষয়, যেগুলো তাঁর পরবর্তী সম্ভাব্য অজ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা রোধে তাঁর চিকিৎসককে সিদ্ধান্ত নিতে এতটাই সাহায্য করবে যেটা আধুনিক, দামি ডাক্তারি পরীক্ষা নিরীক্ষাও করতে পারবে না। অজ্ঞান হওয়া মানুষের যে বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে— ১) মানুষটি চোখ মেলে তাকিয়ে তাঁর বিকল অবস্থা বুঝে নিতে পারছেন কিনা? ২) আপনার কথায় কোনও সাড়া বা সেটা না পারলে আপনার ইঙ্গিতের সাড়া দিতে পারছেন কিনা? সেটা করতে পারলে অন্তত এটা বোঝা যাবে, তিনি তাঁর চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে খানিকটা ওয়াকিবহাল। হয়ত অর্থপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানাতে অক্ষম। ৩) মানুষটির হাত-পা বা মুখে কোনও খিঁচুনি হচ্ছে কিনা? ৪) তাঁর চোখ বন্ধ না খোলা। যদি খোলা হয়, তবে সেটা দিয়ে তিনি আদৌ কিছু দেখতে ও সেই দৃশ্য বুঝতে পারছেন কিনা? ৫) তাঁর চোখ তাঁর নিয়ন্ত্রণে না সেটা ডান-বামে অনিয়ন্ত্রিতভাবে চঞ্চল? ৬) তিনি অসাড়ে প্রস্রাব বা মলত্যাগ করে ফেলেছেন কিনা? ৭) কতক্ষণে তিনি সজ্ঞানে ফিরলেন? ৮) সজ্ঞানে ফেরার তাঁর কী কষ্ট?

এই তথ্যগুলো সেই মানুষটিকে পুনরায় অজ্ঞান না হওয়ার পদক্ষেপ নিতে তাঁর চিকিৎসককে সাহায্য করবে, যেটা আধুনিক চিকিৎসার দামি পরীক্ষাও পারবে না। উমা

গ্রাহক নবীকরণ প্রক্রিয়া আগের মতোই বহাল রয়েছে। নতুন গ্রাহকও করা হচ্ছে। যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়,আমরা আশা করছি আগামী ২০২২-এ বইমেলা হবে। আমরা সেখানে অবশ্যই থাকব এবং আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

হাতে কলমে একবার চেষ্টা করলে হয় না?

ভূপতি চক্রবর্তী

এবছর (২০২১) রাজ্য বোর্ড ও কাউন্সিলের মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত বন্ধ করেই দিতে হল। অবশ্য এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। করোনা অতিমারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। এই সিদ্ধান্তের কিছুদিন আগে দ্বিতীয় ঢেউ যখন আসে নি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি খুলে দিয়ে চেষ্টা হচ্ছিল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার তখন উচ্চ-মাধ্যমিক কাউন্সিল উদ্যোগ নিয়েছিল, উচ্চ-মাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষার অঙ্গ হিসেবে ল্যাবরেটরিভিত্তিক বিষয়গুলির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার অংশটি নিয়ে নেওয়ার। নিঃসন্দেহে তা ছিল এক ভাল প্রয়াস। তবে সেই পরীক্ষা ঘিরে এপ্রিল মাসে সংবাদপত্রে কয়েকটি কৌতুহলোদ্দীপক খবর সামনে এসেছিল। খবরের বিষয়টা যে একেবারে জানা ছিল না এমনটা বলা ঠিক হবে না। তা সত্ত্বেও এই খবরে নতুনত্ব ছিল। এই আলোচনা ওই খবর ঘিরেই।

যে কোনো একটি বছরে মোট উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মাত্র ২০ শতাংশ ল্যাবরেটরি ভিত্তিক বিষয়ে পাঠ নেয়, পরীক্ষা দেয়। এইসব ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা কেবল কাগজে-কলমে সম্পূর্ণ হয় না, তাদের থাকে একটি হাতে-কলমে পরীক্ষার অংশ যার পোশাকি নাম প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা। উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিলের পাঠক্রমে এই সমস্ত বিষয়গুলিতে মোট নম্বরের একটি অংশ রাখা হয়েছে ওই প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার জন্য। একেবারে খুব কম নয়, এই নম্বর বোর্ড ভেদে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। ওইসব বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলের রুটিনে রাখা রয়েছে প্র্যাকটিকাল ক্লাস। এই ক্লাস এবং পরীক্ষা খুব যে ভালভাবে বা কাঙ্ক্ষিত মান রক্ষা করে চলছিল সেকথা হয়ত বলা যাবে না, তবে মনে রাখতে হবে যে, পরীক্ষাগার ভিত্তিক বিষয়গুলি অন্য বিষয় থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে ওই প্র্যাকটিকাল অংশটির ওপর ভিত্তি করে। একথা আমরা তো সর্বদাই বলে থাকি যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তা সে যত চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাকে যাচাই না করা গেলে সেই তত্ত্ব কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যের স্বীকৃতি পায় না। তা পেরোতে পারে না সর্বজনগ্রাহ্যতার চৌকাঠ।

প্র্যাকটিকাল বা ল্যাবরেটরির কাজের গুরুত্ব এখানেই। তাই যখন ওই প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার কথা উঠে এল, আমরা সংবাদপত্রের খবরে জানলাম উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিল ওই পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো গ্রাফ পেপার পাঠায়নি, কারণ এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও অন্তত এবছর কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ তৈরি করেন নি। অতএব প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার

জন্য প্রয়োজনীয় গ্রাফ পেপার কিনে দেবে স্কুল কর্তৃপক্ষ। কেননা এবার ওই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের দায়িত্ব এবার তো তুলে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি স্কুলের হাতে। স্কুলই জানবে ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তার কথা। বস্তুত এটাই ছিল খবর, কেননা এমন ঘটনার কথা আগে বিশেষ শোনা যায়নি। এ যেন কেমন হাত ধুয়ে ফেলার মানসিকতা। অথচ এই ২০২১ সালের পরীক্ষার্থীরা ল্যাবরেটরিতে একেবারে প্রবেশ করে নি, এমন কিন্তু নয়। ২০২০-র মার্চে অতিমারীর প্রভাবে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাওয়ার আগে ২০১৯ সালে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া এই ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু প্রায় ৮-৯ মাস স্বাভাবিকভাবেই স্কুল করেছে। তাই সেদিক থেকে কি আশা করা যায় না যে ঐ সময়ে তারা প্র্যাকটিকাল ক্লাসও করেছে? তাদের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করে বা স্কুলে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে সুষ্ঠুভাবে ঐ পরীক্ষাটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব কি কাউন্সিলের থাকে না?

বিগত এক বছরে বিদ্যালয় স্তরের পঠন-পাঠন কীভাবে চলেছে তা আমরা সকলেই জানি। অনলাইন ক্লাস বহু স্কুলের তরফ থেকে চালানো হয়েছে, শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনেক অসুবিধার মধ্যেও অনলাইনে ক্লাস ও পরীক্ষা নিয়েছেন, নিজের স্কুলে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের পাঠ সংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের একটা অংশ এই অনলাইন ক্লাসের ব্যাপারে নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। তার মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে অর্থনৈতিক অসুবিধা, অন্যদিকে রয়েছে প্রযুক্তিগত সমস্যা। তাদের অনেকের কাছে হয়ত বা ছিল না কম্পিউটার (ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ), কিংবা উপযুক্ত মোবাইল ফোন। কোনো জায়গায় এইসব ছাত্রছাত্রীরা আবার পায়নি ভাল ইন্টারনেট কানেকশন বা ডেটা কানেকশন। তার ওপর জানা গেছে যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণের কোনটাই হাতে পায় নি, প্রযুক্তিগত কারণে নয়, মূলত অর্থনৈতিক কারণে। এই বেদনাদায়ক বিভেদের কথা আমরা জানি। সুতরাং অনলাইনে যা কিছু ক্লাস হয়েছে তার সবটুকু সকল ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, আমরা এই যে অনলাইন ক্লাসের কথা বলছি তার সবটুকুই কিন্তু শ্রেণীকক্ষে বসে পাঠ নেওয়ার ক্লাস, পরিভাষায় যাকে বলা যায় থিওরেটিকাল ক্লাস।

অনলাইনে প্র্যাকটিকাল ক্লাসের কথা বললে অনেক বিদ্রুপ ধেয়ে আসবে। সবচেয়ে বড় কথা সেক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি খুব বড় করে উঠে আসবে, 'তা হলে কি পরীক্ষাগারে না ঢুকেও প্র্যাকটিকাল ক্লাস করা সম্ভব?' সত্যিই তো, তাই যদি হবে, পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা যদি উঠেই যাবে, তাহলে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি অন্য বিষয় থেকে আলাদা হল কি করে? তবু সাহস করে বলে ফেলি যে ঠিকঠাক পরীক্ষাগারে উপস্থিত হয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা বলতে যা বোঝায়, যেভাবে সেটি করার কথা, তা অবশ্যই অনলাইনে করা যায় না; একেবারেই করা যায় না। এই প্র্যাকটিকাল ক্লাসের কোনো বিকল্প হয় না, হতে পারে না। যেখানে শিক্ষক-ছাত্র মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হচ্ছে না, পরীক্ষাগারের যন্ত্রাদি হাতে তুলে নেওয়া যাচ্ছে না সেখানে প্র্যাকটিকাল বলতে যা বোঝায় তা নিশ্চয়ই হওয়া সম্ভব নয়। তবে হাতে-কলমে কাজের কিছু বিষয়ে এক ধরনের ট্রেনিং হয়ত দেওয়া যায়। এবং এরও মূল্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকেরা চিন্তা ভাবনা করেন বলেই জানি এবং তাদের সুযোগ দিলে তারা তাদের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে, পরিস্থিতি মাথায় রেখে 'বিকল্প প্র্যাকটিকাল' বা 'প্র্যাকটিকাল বিষয়ক ট্রেনিং'-এর একটা ভাবনা রাখতে পারেন বা তা নিয়ে নিশ্চয়ই কিছু আইডিয়া দিতে পারবেন। পড়ুয়াদের কাছে সহজলভ্য সামগ্রী দিয়ে তাদের কিছু হাতে কলমে কাজ করার পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা ও মানসিকতা তাদের আছে বলেই বিশ্বাস করি।

একজন পদার্থবিদ্যার শিক্ষক ও তাদের এক সর্বভারতীয় সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে অন্তত কিছু উদাহরণ দিয়ে আমাদের বিষয় নিয়ে দু-একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলতে পারি। যেমন ধরুন, শিক্ষক হয়ত অনলাইনে একটি এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আলোচনা করলেন, হাতে তুলে নিয়ে যন্ত্রপাতি ও সেট-আপ দেখালেন বিভিন্ন কোণে ক্যামেরা রেখে সমস্ত বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দিলেন। এটা তিনি বিদ্যালয়ের ল্যাবে করতে পারেন। তারপর তিনি পড়ুয়াদের পাঠিয়ে দিলেন ঐ এক্সপেরিমেন্টের বিভিন্ন ডেটা, যা সংগৃহীত হয়েছে ওই এক্সপেরিমেন্টটি পরীক্ষাগারে করার মাধ্যমে। অর্থাৎ পুরনো ছাত্ররা হয়ত ওই এক্সপেরিমেন্ট করে এই ডেটা সংগ্রহ করেছে। বিষয়ভেদে এই ডেটা আসতে পারে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমেও। শিক্ষকেরা চাইলে এমন ডেটা তারা আরও নানাভাবে সংগ্রহ করতে পারেন। এবার যদি ছাত্রছাত্রীদের ঐ ডেটা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় লেখচিত্র বা গ্রাফ আঁকতে বলা হয়, নির্দেশ দেওয়া হয় ফলাফল গণনার ও নির্ণয়ের,

তাদের বার করতে বলা হয় পরীক্ষাজনিত ত্রুটি, প্রশ্ন করা হয়, কিভাবে এই পরীক্ষাটি এই যন্ত্রপাতির সাহায্যেই আরও নির্ভরযোগ্য তোলা যায়, ডেটা সংগ্রহে কোন কোন বিষয়ে যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে ইত্যাদি; তাহলে কিন্তু কিছুটা কাজ অবশ্যই হয়। মানছি, অনলাইন থিওরি ক্লাসের সবকটি সমস্যা এখানে থেকে যাবে, তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকেরা এইসব সমস্যা সত্ত্বেও যেমন সিলেবাসের কাগজ-কলম অংশের জন্য ক্লাস নিচ্ছেন তেমনই না হয় নিয়ে দেখতেন।

এছাড়া পদার্থবিদ্যার কথায় বলতে পারি, কয়েকটা এক্সপেরিমেন্ট, তাদের সংখ্যা হয়ত বেশ কম, বাড়ি বসে একেবারে হাতের কাছে যে উপাদান পাওয়া যায় তার সাহায্যে কিন্তু করা সম্ভব। কিংবা হাতের কাছের সামগ্রী দিয়ে কিছুটা বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করে হাতে কলমের কাজটা যে অন্তত কিছুটা সম্ভব নয় তা কিন্তু নয়। যেমন, সরল দোলকের কথা সবথেকে প্রথমে মনে আসে। সরল দোলক দিয়ে প্রথাগত পরীক্ষা ছাড়াও আরও দু-একটি পরীক্ষা সম্ভব। কাঠের স্কেলের মতো একটা ৫০-৬০ সেমি লাঠি (সাধারণত কাঠের দোকানে বিক্রি হয় এবং দাম দশ টাকার মধ্যে) দরজার ফ্রেম থেকে ঝুলিয়ে বেশ কয়েকটি এক্সপেরিমেন্ট করা যায়, যার মধ্যে দিয়ে নির্ণয় করা যায় বিভিন্ন ধরনের কঠিন এবং তরলের ঘনত্ব, তুলনা করা যায় দুটি ভরের। একটা উত্তল লেন্স (দাম হতে পারে ৪০-৫০ টাকার কাছাকাছি এবং একাধিক ছাত্র তা ব্যবহার করতে পারে) ব্যবহার করা যায় দু-তিনটি পরীক্ষা। একটা ছোট সমতল দর্পণের সাহায্যে করা যায় একাধিক পরীক্ষা। সমতল দর্পণের ছোট টুকরো সহজেই মেলে ফটো বাঁধাইয়ের দোকানে, অনেক ক্ষেত্রে বিনামূল্যে। হয়ত সবকটি এক্সপেরিমেন্ট সিলেবাসে নেই কিন্তু হাতে-কলমের কাজের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা যথেষ্ট উপযোগী। এর থেকেও অনায়াসসাধ্য এক্সপেরিমেন্ট রয়েছে, তবে উচ্চমাধ্যমিকের স্তর মাথায় রেখে তার উল্লেখ করা হয়নি, তবে হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য তারাও বেশ কার্যকরী।

আবারও বলব মূল্যায়নের বিষয়টি বড় করে না ভেবে শিক্ষার স্বার্থে এই চিন্তাভাবনাগুলিকে অন্তত সর্বজন সমক্ষে এনে, যাকে আমরা বলি পাবলিক ডোমেইন সেখানে তুলে ধরে আলোচনার বা বিতর্কের জন্য দরজা খোলা উচিত ছিল বলেই মনে হয়। চিন্তার আদানপ্রদানে কিছু ভাল জিনিস বার হয়ে আসার সম্ভাবনার বিষয়টি আমরা সকলেই কিন্তু স্বীকার করি।

তাই মনে হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাউন্সিল এই কাজে উৎসাহ দিতে পারত। বিশেষ করে অতিমারীর পরিস্থিতিতে যখন কোনোভাবেই ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাগারে প্রবেশাধিকার দিয়ে হাতেকলমে বিজ্ঞান পাঠ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তখন এই কাজটাই না হয় একটা পরীক্ষা হিসেবে করে দেখা যেত। আর এই কাজে কাউন্সিলের অনুমোদন ও উৎসাহ থাকলে সম্ভব প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার প্রশ্ন তাঁরা করতেন। আর গ্রাফ পেপারের যোগানও দিতেন তাঁরাই। আমরা জানি যে এই ধরনের কথা উঠলে তার সঙ্গে চলে আসে মূল্যায়নের প্রশ্ন, আসে কিছু বিতর্কও। মূল্যায়নের বিষয়টা নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনার রাস্তা খোলাই রয়েছে। মূল কাজটা শুরু করা গেলে সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়ন সংক্রান্ত আলোচনা ও বিতর্কও না হয় উঠে এল। আপত্তি কি? একটা রাস্তা নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যেত, হতে পারে তা সর্বজনগ্রাহ্য হত না। এমন কাজে উৎসাহ কি দেওয়া যেত না? পুরো কাজটা কি শেখা ও জ্ঞান আহরণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেত না?

মনে রাখতে হবে ২০২০ সালে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে যে পড়ুয়ারা একাদশ শ্রেণীতে প্রবেশ করেছে, তারা কিন্তু ২০২১-এর ফেব্রুয়ারি নাগাদ প্রথম স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ তারা পেয়েছে একাদশ শ্রেণী শুরু হওয়ার পরে প্রথমবার। অবশ্য খুব তাড়াতাড়িই তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। ল্যাবে প্রবেশের সুযোগ তাদের হয়নি। মে মাস জুড়ে আবার সেই হতাশারই চিত্র, যা এখনও চলছে। ২০২২ সালে এই ছাত্রছাত্রীদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে হবে। ২০২১-এ যখন তারা দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রবেশ করছে তখনও তাদের ল্যাবে ঢোকা হল না বললেই চলে। তাই যারা ল্যাবরেটরি ভিত্তিক বিষয়ের পাঠ নিচ্ছে তাদের জন্য কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ কি কিছু চিন্তাভাবনা করবেন? কিছু বিকল্প পথ কিন্তু রয়েছে, যা নিশ্চয়ই প্রথাগত প্র্যাকটিকাল ক্লাসের সৌরভ বহন করে আনবে না। তবু বিজ্ঞানের স্বার্থে যদি পুরোটা না হয় পড়ুয়াদের মানসিক স্বার্থের কথা মাথায় রেখে 'বিকল্প প্র্যাকটিকাল' ক্লাস করানোর ব্যাপারটাই একটা এক্সপেরিমেন্ট হতে পারে। সেটাই একবার হাতে কলমে চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? মনে হয় সেটা শুরু করলে মূল্যায়নের জন্যও উপযুক্ত রাস্তার সন্ধান পাওয়া সহজতর হবে।

উমা

পরীক্ষার একাল সেকাল

নন্দিনী ব্যানার্জী

২০১৯। জুন মাসের সকালবেলা। সুমনা চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ কলিংবেলের আওয়াজ। আচমকা উঠে আবার পড়তে লাগল। একই হস্টেলে থাকে সুমনার প্রিয় বন্ধু মিষ্টি। আজ তাদের স্নাতক স্তরের তৃতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা। মিষ্টির পড়াশোনায় আগ্রহ কম। কিন্তু সুমনা খুব মেধাবী ছাত্রী। তা সত্ত্বেও সুমনা একটু দুশ্চিন্তায় আছে। কারণ স্নাতক স্তরের পরীক্ষা রীতিমতো কঠিন, অনেক পরিশ্রম করলেই ভাল রেজাল্ট করা সম্ভব। মিষ্টির অত চিন্তা নেই। পাশ করে গেলেই হল।

একই কলেজে পড়ার জন্যে ওদের পরীক্ষার সেন্টারও একই।। পরীক্ষা ১২টায় শুরু। প্রথমদিনের পরীক্ষা বলে কথা। ওরা ১২টার বেশ খানিকক্ষণ আগেই পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে গেল। সুমনা একটা গাছের নীচে বসে পড়া ঝালিয়ে নিতে লাগল। সারা বছর ধরে রুটিন মেনে পড়াশোনা। তবে পরীক্ষা সে নীচু শ্রেণীরই হোক বা উঁচু শ্রেণীর— ‘Exam is Exam’। পরীক্ষা নামক মহাযুদ্ধে শুধু পরীক্ষার্থী নয়, অভিভাবক ও শিক্ষকদের বিশাল ভূমিকা থাকে। যখন পরীক্ষার অন্তিম পর্যায় এসে পড়ে, তখন পরীক্ষার্থীদের আর পথেঘাটে দেখা যায় না। মনে হয় তারা যেন পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গল গ্রহে গিয়ে বাস করতে শুরু করেছে। চারিদিকে যেন পরীক্ষার এক গম্ভীর আবহাওয়া।

মিষ্টি সুমনার ডাকে ভাবনা থেকে বাস্তবে ফিরে এল। সুমনা মিষ্টিকে বলে, এদিক ওদিক না তাকিয়ে একটু পড়। কিন্তু মিষ্টির মন তো পড়ায় নেই! বইয়ের পাতার দিকে তাকালেই টেনশন বাড়ছে। তাই টেনশন কমানোর জন্য সে পরীক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। পরীক্ষার্থীদের অনেকের কপালে দই-এর ফোঁটা, কারুর মা পুজোর আশীর্বাদী ফুল মাথায় ঠেকিয়ে দিচ্ছে, কেউ কেউ আবার প্রণাম করে বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিচ্ছে। অন্যদিকে কোনো কোনো পরীক্ষার্থী করুণ মুখে বসে আছে, চোখ ছলছল। কেউ কেউ বই হাতে টেনশনে পায়চারি করে শেষ মুহূর্তের পড়াটুকু করে নিচ্ছে। আবার একদল ছেলে বিন্দাস আছে। কোনো টেনশন নেই। বন্ধুদের সাথে গল্প করছে, হাসাহাসি করছে।

পরীক্ষার ঘণ্টার শব্দে মিষ্টি চমকে উঠল। এবার পরীক্ষার ঘরে ঢোকার পালা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওরা রুম খুঁজে পেল। পরীক্ষার রুমে অনেকের বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন সিট খুঁজে দিচ্ছেন। সুমনা আর মিষ্টির সাথে কেউ যায় নি। ওরা নিজেরাই খুঁজে নিল ওদের বসার জায়গা। সুমনার সিট ছিল সামনের দিকে, মিষ্টির ছিল মাঝামাঝি জায়গায়। দুটি মেয়ে আলোচনা করছিল— সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো যেন একে অপরকে একে অপরকে বলে দেয়। সামনের বেঞ্চের একটা ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। মিষ্টির পাশে বসা মেয়েটা ঘড়ির সময় ঠিক করছে, ৫ মিনিট বাড়িয়ে সময় ঠিক করল। মিষ্টি বুঝতে পারল যাতে ৫ মিনিট আগে সমস্ত লেখা সম্পন্ন করতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিদর্শকেরা পরীক্ষার ঘরে ঢুকতেই সমস্ত হল যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই বইখাতা হলের বাইরে রেখে এল। সঙ্গে থাকল কয়েকটা পেন, স্কেল আর জলের বোতল। পরিদর্শকরা সময়মতো প্রশ্নপত্র দিলেন। সুমনা তখনও ভীষণ টেনশনে। পরীক্ষার এই ৩ ঘণ্টা যেন পরীক্ষার্থীদের জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

পরীক্ষা শেষে সবাই বেরিয়ে এল। কেউ খুব আনন্দিত, কেউ দুঃখিত। সুমনা দৌড়ে এল, সে আনন্দে আত্মহারা। পরীক্ষার আগে সে যতটা ভীত ছিল, এখন তার দ্বিগুণ আনন্দিত। পরীক্ষা খুব ভাল হয়েছে। মিষ্টিরও তাই। তারা হস্টেলে ফিরে এল তারা। এইভাবেই বাকি পরীক্ষাগুলোও তারা দিয়ে ফেলল। পরীক্ষা শেষে হস্টেল ছেড়ে তাদের বাড়ি ফেরার পালা। দুজনেরই খুব মন খারাপ।

দু'মাস পরে পরীক্ষার রেজাল্টের দিন। মিষ্টি প্রথম শ্রেণী পেয়েছে আর সুমনা কলেজ টপার। এরপরে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হওয়ার পালা। ভর্তি হওয়া, ক্লাস সবই ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎ মার্চ মাসে দেশজুড়ে লকডাউন। সারা ভারতবাসী আতঙ্কিত। জরুরি কাজ না থাকলে বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না। যানবাহন বন্ধ। দোকান বাজার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া খোলা থাকবে না। কিন্তু কেন হঠাৎ এই লকডাউন? লকডাউনের হেতু করোনা ভাইরাস। যার উৎপত্তি হয়েছিল চীন দেশের উহান প্রদেশে। ধীরে ধীরে গোটা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলে এই ভাইরাস। লকডাউন— যা অনেকের কেড়েছে অন্ন, অনেক প্রিয়জনের প্রাণও। সমস্ত শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান বন্ধ। বন্ধ অফিস, আদালত। বিশ্বব্যাপী এইরকম অভিজ্ঞতা মনে হয় না এর আগে কখনও হয়েছে। কিন্তু এইভাবে তো বেশিদিন চলতে পারে না।

শুরু হল 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন-এ ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মতোই শুরু হল সুমনা ও মিষ্টির ঘরবন্দী জীবন। তবে আশার আলো এইটুকুই শিক্ষক শিক্ষিকারা অনলাইন-এ ক্লাস করাবেন। এইসব শুনে সুমনা ও মিষ্টিরা একটু অবাকই হয়েছিল। কারণ এটা কীভাবে সম্ভব? ধীরে ধীরে বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম-এ শুরু হল ক্লাস। এভাবে ক্লাস হবার পর পরীক্ষার দোরগোড়ায় এসে হাজির হয় তারা। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর ঘোষণা হল পরীক্ষা হবে অনলাইন-এ যার নামটা বেশ— 'ওপেন বুক এক্সামিনেশন'। তাতে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মতো মিষ্টি খুব খুশি। বই দেখে লেখা তো। পড়তে হবে না। পড়া মনে রাখতে হবে না। বাড়িতে বসে পরীক্ষা। পড়া মনে রাখতে হবে না। ভাবা যায়! একরাশ টেনশন নিয়ে পরীক্ষার হলে যেতে হবে না। শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে না। কি মজা!

সুমনা কিন্তু আগের মতোই পড়াশোনা করতে থাকল। মিষ্টির এইরকম ভাবনাটাই কাল হল পরীক্ষার দিন। প্রশ্নগুলো যেন মিষ্টির ভীষণ অপরিচিত। পুরো বই ঘেঁটেও উত্তর মিলল না। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মিষ্টিকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছিল। কোনরকমে বন্ধুদের ফোন করে গুগল মিট-এ কথোপকথনের মাধ্যমে কিছু উত্তর খুঁজে পেল। এই সময় বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ভীষণ সাহায্য করল। তবে পরীক্ষা শেষে মিষ্টি বুঝল পরীক্ষা অনলাইন বা অফলাইন হোক— সুমনার মতো পড়াশোনা করে যাওয়াটাই শ্রেয়।

অনলাইন ব্যবস্থায় হইহুল্লোড় করে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, পরীক্ষা শেষে কলেজের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ফুচকা, ঝালমুড়ি খাওয়ার ব্যাপারটা যেন এখন ছাত্রছাত্রীদের কাছে অতীত হয়ে গেছে। বাড়িতে বসে এখন যেন সবাই ক্লান্ত। এই লম্বা ছুটি থেকে যেন তাদের মন পরিত্রাণ চায়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের খোলা আকাশের নীচে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস চায়। সুমনা আর মিষ্টির মনে হয়, এই অনলাইন ব্যবস্থা কোথাও যেন তাদের একা করে দিয়েছে, বন্ধুহীন করে তুলেছে।

'শেষের কবিতা'র একটা লাইন মনে পড়ে গেল—'যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা আর বাঁধা পশুকে শিকার করা একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।' উমা

পরিবেশকেন্দ্রিক উন্নয়ন কাম্য — উন্নয়নকেন্দ্রিক পরিবেশ নয়

নন্দগোপাল পাত্র

করোনা অতিমারীর মধ্যে পার হয়ে গেল আরও একটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এ বছর দিবসটির থিম নির্ধারণ করা হয়েছিল 'বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করা'। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এবারের থিমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি, ইকোসিস্টেমগুলোকে ধ্বংস করে মানুষের জন্য কোনও কল্যাণ আনা যায় নি। ইকোসিস্টেমগুলো ধ্বংস করা হয়েছে নানা কাজে, নানা সময়ে। বিশেষ করে ধ্বংস করা হয়েছে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রয়োজনে। প্রশ্ন আসতে পারে, আমরা কি নগরায়ণ ও শিল্পায়ন করব না? আমরা নগরায়ণ ও শিল্পায়ন অবশ্যই করব। কিন্তু এতদিন ধরে আমরা 'আগে উন্নয়ন, পরে পরিবেশ' মডেলকে অনুসরণ করে এসেছি। নানা বিপর্যয়ের মুখে মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে যে, এ মডেল সঠিক নয়।

'পরিবেশ' আজ কেবল সংরক্ষণ বা পাবলিক ক্যাম্পেইনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নেই, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানের মতো স্বতন্ত্র বিভাগগুলো পরিবেশের তাত্ত্বিক ও গবেষণাধর্মীয় দিকগুলোকেও শক্তিশালী করে তুলছে। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আমরা কতটা প্রস্তুত? রাষ্ট্র হিসেবে বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় আমাদের অবস্থান কতখানি সক্রিয় ও সংবেদনশীল? এসব প্রশ্ন ও তর্কের রাজনৈতিক সুরাহা দরকার। কারণ বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ না থামালে প্রিয় জন্মভূমি কী সবুজ গ্রহ কোনওটাই আর আমাদের জন্য বসবাস উপযোগী থাকবে না। নিশ্চিতভাবে আলোচনায় চলে আসবে জলবায়ু বিপর্যয়ের বিরূপ প্রভাব। আমরা দেখছি তীব্র গরম, খরা, লাগাতার ঘূর্ণিঝড় বেড়েই চলেছে। আর এর ফলে দুর্ভোগ ও দুঃসহ যন্ত্রণা কিন্তু এখনও বেশি পোহাতে হচ্ছে দেশের গরিব মানুষকে, যারা বাস্তুতন্ত্রকে সবচেয়ে কম

ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বাস্তুতন্ত্রের ন্যায্যতা পূরণে আজ পরিবেশ প্রশ্নকেও শ্রেণীকাঠামোর ভেতর থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রকৃতি আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হয়ত অনেকেই করোনা অতিমারী শুরু হওয়ার পর কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে বহু বছর ধরে। তাও এখন অনেকেই এড়িয়ে চলেন সেই সচেতন বার্তা। বর্তমান অন্ধকারময় পরিস্থিতিতে অতীতকে ফেরানো সম্ভব নয় ঠিকই। কিন্তু আমরা গাছ লাগাতে পারি, আমাদের আশেপাশের শহরকে আরও সবুজ করতে পারি, বাড়ির বাগান পুনর্নির্মাণ করতে পারি, নিজেদের ডায়েট পরিবর্তন করতে পারি এবং নদী ও উপকূল পরিষ্কার রাখতে পারি। আমরা এমন একটি প্রজন্ম যারা এই সবের মাধ্যমে প্রকৃতির শান্তি বজায় রাখতে পারি। সেই জন্যেই এবছর 'বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করা' থিমটি বেছে নেওয়া হয়েছে। উদ্বিগ্ন না হয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে পরিবেশের সচেতনতার বিষয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা উচিত। এখনও কিছুটা সময় আছে। যদি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করেন তাহলে এই সুন্দর ধরণী থাকবে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যমলা।

আমাদের চোখের সামনে আমাদের ভেতর দিয়েই বদলে যাচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে চারপাশের পরিবেশ। পরিবেশ কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ নয় আজ নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার বাণিজ্যিক পণ্য। কিন্তু তারপরও গ্রাম থেকে শহর এখনও বহু মানুষ পরিবেশ রক্ষায় জানপ্রাণ দিয়ে লড়ছেন। গ্রাম ও শহরের পরিবেশগত সমস্যা কী বাস্তুতন্ত্রের সংকট এক নয়? শহর কী গ্রাম পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধারে তাই আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের দায়িত্ববোধকে চাঙা করা জরুরি। প্রকৃতিতে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য উপাদানের এই পরনির্ভরশীল সম্পর্কের ভেতর দিয়ে তৈরি হয় এক-একটি স্বতন্ত্র বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুসংস্থান। মানুষ হিসেবে আমাদের ভাবা দরকার আমরা কোন ধরনের বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে মিশে আছি, এই বাস্তুতন্ত্র কীভাবে কী প্রক্রিয়ায় সেবা দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু মানুষ প্রতিদিন নিজের ভোগ আর মুনাফার জন্য বাস্তুতন্ত্রের এই ছন্দময় ব্যাকরণ চুরমার করে ফেলছে। আর এর প্রভাবেই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা দুর্যোগ কী করোনার মতো ভয়াবহ মহামারী সামাল দিতে হচ্ছে মানুষকে। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ও জলবায়ু পরিবর্তনেরই ফলাফল। ভারতে গত ১২০ বছরে 'সাইক্লোনিক অ্যাক্টিভিটি' বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬ শতাংশ। ১৯৭১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ভারতে মোট ১২৭টি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা পাঁচ। দি কাউন্সিল অন এনার্জি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার-এর তথ্য অনুযায়ী গত এক দশকে ঘূর্ণিঝড়ে ভারতে ৬০০টি জেলার মধ্যে ২৫৮টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজি-র এক স্টাডি রিপোর্ট জানাচ্ছে গত চল্লিশ বছরে বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগরের পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রা বেড়েছে ১.২-১.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এর ফলে সমুদ্রে জলতলের উচ্চতা প্রতি বছর গড়ে ১.৬-১.৭ মিলিমিটার বাড়ছে। গবেষকগণ বলছেন ২০৫০ সালে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বেড়ে হতে পারে ৫০ সেমি। এখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি নজিরবিহীন জলোচ্ছাস।

বিগত কয়েক দশকে আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে জীববৈচিত্র। যা বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম প্রধান উপাদান। বহু প্রাণী পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এভাবে চললে আগামী দশ বছরের মধ্যে আমাদের চেনা প্রাণীদের ২৫% বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের পরিবেশের এ হাল হওয়ার কারণ, আমরা উন্নয়নের যে মডেল বেছে নিয়েছি, তা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। আমরা প্রকৃতিকে সম্মান না করে বরং কীভাবে প্রকৃতিকে জয় করা যায়, তা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছি। মনে রাখতে হবে, যথাযথভাবে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ না করে, জনমতকে উপেক্ষা করে যদি কোনো উন্নয়ন করা হয়, তাহলে তা কখনই টেকসই হবে না। একতরফাভাবে উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বন, পাহাড়, সমুদ্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া যাবে না।

স্থলজ জীববৈচিত্রের ৮০%-এর উৎসই হল বনভূমি। তাই বনভূমি সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের কোনও বিকল্প নেই। ডেনমার্কের সম-আয়তন অরণ্য প্রতি বছর হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। সমস্যা হল, বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি তো শুধুমাত্র পরিবেশেই আবদ্ধ থাকে না, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব মানুষের জীবন এবং জীবিকার উপরে পড়ে। সুতরাং, সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা না হলে এই মানুষগুলির অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখে পড়বে। পৃথিবীকে সুস্থ রাখার জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ। এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম 'ইকোসিস্টেম রেসটোরেশন' বা 'বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করা' নিজেদের স্বার্থে সার্থক করে তুলতে হবে। এর জন্য বছর জুড়ে 'রিইমাজিন, রিক্রিয়েট, রেস্টোর' এই ভাবনায় আমাদের উন্নয়ন করতে হবে পরিবেশকে রক্ষা করে। অর্থাৎ উন্নয়ন হতে হবে পরিবেশকেন্দ্রিক, পরিবেশ কখনও উন্নয়নকেন্দ্রিক হবে না। অন্যথায়, বিক্ষিপ্তভাবে দুই-একটি 'সু-সংবাদ' আশা জাগাবে, কিন্তু পরিবেশ বাঁচবে না। উমা

উনিশে মে
উনিশশো একষট্টি

মৃদুল ঘোষ

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের ফলে বহু বাংলাভাষী মানুষের প্রাণে যায়। মাতৃভাষার জন্য সেই আত্মত্যাগ বিফলে যায় নি। ১৯৭১-এ জন্ম হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রসঙ্ঘ মাতৃভাষার জন্য এই আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ২১ ফেব্রুয়ারিকে সারা বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। বরাক উপত্যকায় ১৯৬১-র ১৯ মে সংঘটিত হয়েছিল এরকমই এক ভাষা আন্দোলন। সেই ভাষা আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগের কথা আজ ইতিহাস।

'বরাক উপত্যকা' নামটি প্রচলিত হয় বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। নবগঠিত আসামে দুটি উপত্যকা— একটি ব্রহ্মপুত্র, অন্যটি বরাক। বরাক উপত্যকা পূর্বকালের সুরমা উপত্যকার খণ্ডাংশ মাত্র। অবিভক্ত কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলা ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, কাছাড় জেলা মিলে গঠিত বরাক উপত্যকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। আজ ভাষা শহিদদের আত্মবলিদানের ৬০ বছর পরেও বরাক উপত্যকার মানুষেরা রীতিমতো নিজের মাতৃভাষার অধিকার নিয়ে চিন্তিত। ভাষিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বরাকের সিংহভাগ মানুষের মনে একটি চিন্তা— তাঁদের এই আত্মদান সার্থক হবে তো? বরাকে বাংলাভাষার আন্দোলনের পূর্ব-ইতিহাসের দিকে একটু ফিরে দেখলে এ সত্যতা যাচাই হতে পারে।

মহাভারতের যুগে বরাক নদীর নাম ছিল 'বরবক্র' — উৎস মণিপুর, মোহনা বাংলাদেশ সীমান্ত। এই দুই নদীর শাখা— একটি সুরমা, অন্যটি কুশিয়ারা। বরাকের উত্তরে খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, বড়াইল পাহাড়, দক্ষিণে মিজোরাম, লুসাই, ত্রিপুরার বিভিন্ন পর্বত, পূর্বে মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমে বাংলাদেশ সীমানা। একাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট স্বাধীন রাজ্য হলে করিমগঞ্জ তার অন্তর্ভুক্ত হয়; কিন্তু তা ছিল বৃহৎ বঙ্গে সীমায়িত। ১৩০৩ সালে সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে শ্রীহট্ট সুলতানদের হাতে আসে। মুসলিম শাসনের সূচনাকাল থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীহট্ট তথা করিমগঞ্জ ছিল বাংলার সুবেদার শাসিত অঞ্চল। ১৭৬৫-তে করিমগঞ্জ ব্রিটিশ শাসনে চলে আসে। ১৮৭৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শ্রীহট্টকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হলে করিমগঞ্জ আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল আসাম পৃথক হলে করিমগঞ্জ বাংলা থেকে বিচ্যুত হয়। ১৯৪৭-র দেশভাগের সময় গণভোটের ভিত্তিতে করিমগঞ্জ তথা বরাকের পশ্চিমাংশ আসামের সঙ্গে থেকে যায়।

ডিমাসা রাজাদের সময় থেকে কাছাড়ের সরকারি ভাষা ছিল বাংলা। বরাক উপত্যকায় ভাষা সমস্যার সূচনা হয় ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে। বঙ্গদেশে বাংলাকে সরকারি ভাষা বানিয়ে ইংরেজরা আসামেও সরকারি দপ্তর, আদালত ও শিক্ষায় বাংলা ভাষার প্রচলন করেছিল। ইংরেজরা শাসন পরিচালনায় সুবিধার জন্য এই নীতি নেয়। কিন্তু অসমিয়ারা ভাবে এতে বাঙালিদের ইন্ধন রয়েছে। ১৮৭৩-এ আসামে অসমিয়া ভাষা প্রাধান্য পায়। এই সময় বাংলাভাষী মানুষদের ওপরে শুরু হয় নির্যাতন। বরাকের মানুষেরা আসামের মানুষদের কাছে হয়ে যায় 'বিদেশী'। ১৯৩৭ সালে জওহরলাল নেহরু আসাম সফরে এলে 'আসাম সংরক্ষণী সভা'র পক্ষে নীলমণি ফুকন অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী স্মারক পত্র দিয়ে আসামের অসমিয়া ও হিন্দু চরিত্র বহাল রাখতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এতে বিশেষ কোন কাজ হয় নি।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর অসমিয়া ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে পরিপন্থী বলে মনে করা হয়। আসাম রাজ্যে বাঙালিদের বিদেশী এবং বহিরাগত রূপে চিহ্নিত করার হীন অপপ্রয়াস শুরু হয়। ভাষা, শিক্ষা, ভূমিব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতি উপেক্ষা, বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক আচরণ চলতে থাকে। স্বাধীন দেশে যেন সৃষ্টি হয় এক নতুন পরাধীন জাতি। ১৯৫১ সালের জনগণনায় ব্যাপক কারচুপিতে বাংলাভাষী মানুষের

সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হ্রাস ঘটে। ফলে ১৯৫১ ও'৫৪-তে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় শুরু হয় বাঙাল-খেদা আন্দোলন। ১৯৬০ সালে বাঙ্গাল-খেদা দাঙ্গা চরম স্তরে পৌঁছে যায়। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে অসমিয়াকে একমাত্র সরকারি ভাষা করবার দাবি ওঠে। পরিণামে সে বছর ১০ অক্টোবর আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা আসাম ভাষা বিল উত্থাপন করেন এবং প্রবল বিরোধিতার মধ্যে ২৪ অক্টোবর বিলটি বিধানসভায় পাশ হয়।

আসামে বাংলাভাষী মানুষেরা শুরু করে জোরালো প্রতিবাদ। ১৯৬১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের ওপরে অসমিয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে গঠিত হয় 'কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ' সংগঠন গঠিত হয়। ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিন আসাম সরকারের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিলচর, করিমগঞ্জ আর হাইলাকান্দিতে 'সংকল্প দিবস' পালিত হয়। বরাকের মানুষকে ভাষার দাবিতে সোচ্চার করতে ২৪ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত সত্যাগ্রহীরা পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালায়। সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে ১৩মে-র মধ্যে বাংলাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি না দিলে ১৯ মে সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হবে। এর প্রেক্ষিতে ১২ মে আসাম রাইফেল, মাদ্রাজ রেজিমেন্ট ও কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী শিলচরে ফ্ল্যাগ মার্চ করে। ১৮ মে তারিখে আসাম পুলিশ আন্দোলনের তিনজন নেতা নলিনীকান্ত দাস, রথীন্দ্রনাথ সেন ও বিধুভূষণ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। ফলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল, শুরু হল প্রবল আন্দোলন।

বরাকের আপামর বাংলাভাষী মানুষেরা মিলে মাতৃভাষা রক্ষার জন্য প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯ মে শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দির সরকারি কার্যালয়, শিলচর রেলওয়ে স্টেশন, কোর্ট চত্বরে হরতাল ও পিকেটিং শুরু হয়। বিকেল ৪টায় হরতাল শেষ করার কথা ছিল, কিন্তু এর মধ্যেই আসাম রাইফেলের বিশাল পুলিশ বাহিনী স্টেশনে হাজির হয়। দুপুর আড়াইটেতে ৯জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দুটো পঁয়তিরিশ নাগাদ স্টেশনের সুরক্ষায় থাকা প্যারামিলিটারি বাহিনী আন্দোলনকারীদের লক্ষ করে ১৭ রাউন্ড গুলি চালায়। শহিদ হন এগারো জন ভাষা সৈনিক। ২০ মে শিলচরের জনগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শহিদদের শবদেহ নিয়ে শোক মিছিল করে প্রতিবাদ জানায়। বাধ্য হয়ে সেদিন আসাম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। শহিদদের স্মৃতিতে আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ সহ পৃথিবীর বাংলাভাষী মানুষ ১০মে বাংলা 'ভাষা শহিদ দিবস' হিসেবে স্মরণ করে।

১৯৬০-এ আসামে একভাষা নীতি ছিল সংবিধান পরিপন্থী। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বরাকের বাঙালিরা মাতৃভাষার অধিকার ফিরে পেয়েছে। কিন্তু বরাক উপত্যকায় অসমিয়ার আগ্রাসন থেকে বাংলা ভাষার মুক্তি নেই। আজও অসম রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সরকারি কাজে এক ভাষানীতির প্রয়োগে বাংলার উপর চলছে আধিপত্যবাদের রাজনীতি। স্কুল কলেজ কিংবা বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে সরকারি পাঠ্য পুস্তকের প্রকাশনায় নির্বিচারে বাংলার বাক্যগঠন রীতির বদলে সচেতনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে অসমিয়া বাক্যের গঠনরীতি। বাংলা শব্দের প্রাচুর্য থাকলেও অসমিয়া শব্দ ও বানান ব্যবহার করে বাংলাভাষার দুর্বলতা প্রকাশের চক্রান্ত চলছে। শতাংশের বিচারে এখনো আসামে বাঙালিরা দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। কিন্তু সেই জনগোষ্ঠীর মানুষদের বাদ দিয়ে সরকার অন্য ক্ষুদ্র ভাষাভাষী মানুষের ভাষার উন্নতিতে সদিচ্ছা দেখাচ্ছে। বাংলা ভাষাকে উপেক্ষার চোখে দেখা হচ্ছে। এটাও কিন্তু ভাষা আগ্রাসনের রকমফের মাত্র। ভাষা আগ্রাসনের মুখে দুই দেশের মানুষেরা প্রাণ বলিদান দিয়ে বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার মহত্ত্বকে স্মরণীয় করে রেখেছে। কিন্তু ভাষা অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে সর্বদা। অন্যদিকে অন্যান্য ভাষার বৈচিত্রের প্রতিও সংবেদনশীল মনোভাব পোষণ করতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থ—

১. সুবীর কর, বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস, প্রকাশক- শ্রীমতী রীতা কর, রিমগঞ্জ, ১ম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৯।

২. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কল-৭৩, ১ম প্রকাশ ১৩৫৬।

৩. সনৎকুমার চৌধুরী, ১৯শের স্মৃতিকথা, ইন্ডিয়া প্রেস, শিলচর, ১ম প্রকাশ ২০১১।

৪) দিলীপকান্তি লস্কর, আসামে বাংলাভাষার সংকট, উত্তর ত্রিপুরা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং ওয়ার্কস্, কৈলাশশহর, ত্রিপুরা, ১ম প্রকাশ ২০০৩।

উমা

বৈজ্ঞানিক মেজাজ

শ্যামল ভদ্র

গত ২০ আগস্ট ২০২১ দেশ জুড়ে পালিত হয় 'বৈজ্ঞানিক মেজাজ' বা 'বিজ্ঞান মনস্কতা' দিবস। দিনটি বিশেষ কারণে স্মরণীয়। ২০ আগস্ট ২০১৩ আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন নরেন্দ্র দাভোলকর। তাঁরই হাত ধরে মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'অন্ধ শ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল এই সমিতি। পাশে পেয়েছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারকে। তাঁদের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রর বিধানসভায় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস বিরোধী বিল পাস ও তার আইনি রূপ দেবার জোরালো দাবি উঠেছিল। দাভোলকরের মৃত্যুর পরই দ্রুততার সাথে সেই আইন পাস করানো হয়। ভারতবর্ষে আর কোনো রাজ্যে এই আইন লাগু হয়েছে বলে জানা নেই। দাভোলকর বলেছিলেন যে, 'ততটুকুই গ্রহণীয় যতটুকুর সাক্ষ্য প্রমাণ আছে'— এটাই হওয়া উচিত মানুষের মনে বৈজ্ঞানিক মেজাজ (সায়েন্টিফিক টেম্পার) সৃষ্টির মূল বৈশিষ্ট।

মাত্র কয়েক বছর আগেই গৌরী লঙ্কেশ, গোবিন্দ পানেসর ও কালবুর্গিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাঁরা সমাজের অন্যায় ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। দেশজুড়ে আরো অনেক মানুষজন ও সংগঠনকে চূড়ান্ত হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। আমাদের দেশের সংবিধান সাধারণ নাগরিকদের বৈজ্ঞানিক মেজাজকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তা প্রকাশ করলেই রাষ্ট্রের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে, নির্যাতিত হতে হচ্ছে। তাই বর্তমান সময়ে ২০ আগস্ট বিশেষ দিনটি পালন করা তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লেখ্য মধ্যযুগে এক বিস্তীর্ণ সময় জুড়ে সত্যান্বেষী মানুষের উপর অত্যাচার ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। সেই সময়ে নব্যচিন্তার নায়ক, বিজ্ঞানী এবং সমাজ সংস্কারক মানুষজনকে চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছিল, ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তিনিই প্রথম বলেছিলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। সেই সময়ে এরকম ধারণা প্রকাশ করাই ছিল প্রচণ্ড অপরাধ, কারণ তখনকার সমাজ সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় নিগড়ে বাঁধা ছিল। তারপর কেপলার ও গ্যালিলিওকে কারান্তরালে কাটাতে হয়েছিল জীবনের শেষ দিনগুলি।

বিখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস বইটিতে মন্তব্য করেছিলেন যে, ধর্ম (রিলিজিয়ন) ও বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী পরিসরটা অনেক বড়, তাই এখানেই যত কনফ্লিক্ট, যদিও দেকার্তের দর্শন একটি ব্যতিক্রম। রাসেল আরও বলেছেন যে, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠাকারীদের দুটি বিশেষ গুণ ছিল, পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অসীম ধৈর্য এবং প্রকল্প প্রণয়নে অত্যন্ত সাহসী। এই গুণগুলি জ্যোতির্বিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বিদ্যমান ছিল।

মধ্যযুগ থেকে রেনেসাঁসে উত্তরণ দ্রুত সভ্যতার শিখরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। আমাদের দেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁদের সারাটা জীবন সমাজ সংস্কার, বিজ্ঞান চেতনার প্রসারে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। পরবর্তীতে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও আরও অনেকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেই ধারা অক্ষুণ্ণ

থাকে, অথচ স্বাধীনতার উত্তরকালে সেই ধারারই অবক্ষয় হতে থাকে যা আজও অব্যাহত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে কোপারনিকাস সম্পর্কে অসাধারণ এক বর্ণনা দিয়েছেন, যা তখনকার যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল বলেই মনে হয়।

লোকশিখা গ্রন্থমালার অন্তর্গত বিজ্ঞান বিষয়ক বই ‘বিশ্বপরিচয়’-এর পাণ্ডুলিপির কাজ ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ায় বসে সম্পূর্ণ করেছিলেন। ঐ বছরেই বইটি প্রকাশিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ বইটি সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে লেখেন: ‘‘শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।’’ আরও লেখেন তাঁর ১২ বছর বয়সে অভিজ্ঞতার কথা — ‘‘জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে।’’ তাই রবীন্দ্রনাথের মহাবিশ্বে ও মহাকাশের কল্পনার জগতে বিচরণ সর্বদাই সেই বৈজ্ঞানিক মেজাজটাই কাজ করেছে, যা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সেই ছোট্ট বয়সে। গান্ধীজি ১৯৩৪ সালে যখন বিহারের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানির পরে বলেছিলেন যে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের পাপের ফল। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ ঐ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন, যা তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

বর্তমান সমাজে অস্থিরতা ও হানাহানি ক্রমশ বেড়েই চলেছে, শিক্ষা ব্যবস্থায় মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ এক অশনি সংকেত। মুক্তচিন্তার পরিসর ক্রমশই কমে আসছে, তাই প্রয়োজন সুস্থ বিজ্ঞান চেতনার প্রসার সমাজের সমস্ত স্তরে। দার্শনিক-চিন্তক অম্লান দত্ত মৃত্যুর ঠিক আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সভায় বলেছিলেন যে, সত্যের সাথে সত্যের কোনো সংঘাত হয় না — সংঘাত শুধু হিংসার সাথে সত্যের। যেমন ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের।

উমা

<u>একটি প্রতিবেদন</u>

শিক্ষায়তনে ‘জ্যোতিষশাস্ত্র’ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে জাতীয় কনভেনশন

শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অন্যান্য অবৈজ্ঞানিক ধারণার প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি গত ২৪ জুলাই, ২০২১ একটি অনলাইন কনভেনশনের আয়োজন করে। এই কনভেনশনে অধ্যাপক পার্থপ্রতিম মজুমদার (প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, এন-আই-বি-এম-জি, কল্যাণী এবং প্রেসিডেন্ট, ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস, বেঙ্গালুরু), অধ্যাপক অনিকেত সুলে (হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর একটি ইউনিট) এবং অধ্যাপক সুনীল মুখী (আই-আই-এস-ই-আর, পুনে, এস এস ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী) মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী (আই আই এস ই আর, কলকাতা, এস এস ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী এবং ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক) উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এবং কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় (ভূতত্ত্ববিদ, আই এন এস এ ফেলো এবং প্রাক্তন অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী বলেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে তোলার কাজ একটি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং তা নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পর থেকেই আমরা শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। সাম্প্রতিকতম পরিবর্তন হচ্ছে পাঠ্যক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অন্যান্য অবৈজ্ঞানিক বিষয়ের প্রবর্তন। বিশেষ করে, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় জ্যোতিষশাস্ত্রে একটি নতুন এম এ কোর্স চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। অনেক বিজ্ঞানী এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু, দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকৃত করার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য দেশের বৈজ্ঞানিক

সম্প্রদায়ের একটি ঐকান্তিক ও ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু করার সময় এখন এসেছে। এ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি সংকল্প গ্রহণের জন্য এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল।

সম্মেলনের চেয়ারম্যান ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রাথমিক বক্তব্যে বলেন, এই সমাজে, বিশেষ করে শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা বর্তমানে ঘটছে। আমাদের সংবিধান আমাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মননের বিকাশ ঘটাতে নির্দেশ দিয়েছে এবং সম্ভবত এটি আমাদের সংবিধানের একটি অনন্য বিষয়। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস এবং চর্চার একটি পরিবেশ সুকৌশলে সমাজে আনা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের কোর্স হিসাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্তন এর একটি প্রকাশ মাত্র। অনুরূপ উপায়ে, শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধরনের অনেকগুলি চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করানো হচ্ছে, যেমন তথাকথিত বৈদিক গণিতের শিক্ষা, আয়ুষকে প্রচলিত আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করা, ভারতীয় ইতিহাসের পুনর্লিখন এবং আরও অনেক কিছু। যে কোনও যুক্তিসঙ্গত বিরোধিতা বা যুক্তিযুক্ত সমালোচনা তাদের মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক ঘটায়। দাভোলকর, কালবুর্গি, পানসারে, গৌরী লংকেশ এবং আরও অনেককে তাদের জীবন দিতে হয়েছে। এটি মারাত্মক একটি প্রচেষ্টা এবং এটি দেশের সামাজিক পরিবেশকে নষ্ট করছে। ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি মনে করে যে, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে উন্নীত করতে আওয়াজ তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যানের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর মিস দীপ্তি শিক্ষায় অবৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু ঢোকানোর বিরুদ্ধে একটি খসড়া প্রস্তাব কনভেনশনে বিবেচনা এবং সমর্থনের জন্য পেশ করেন।

এরপর অধ্যাপক পার্থপ্রতিম মজুমদার উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্তি বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র হিসেবে জ্যোতিষশাস্ত্রকে বৈধতা প্রদান করবে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। আমরা দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে জ্যোতিষশাস্ত্র একটি বৈজ্ঞানিক ধারণা নয়, কারণ এটি বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করে না। ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি জ্যোতিষশাস্ত্রকে আনুষ্ঠানিক কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করে ছদ্ম-বিজ্ঞানকে বৈধতা দিচ্ছে। এটি আসলে একটি ব্যাপক কার্যক্রমের খুব ছোট একটি অংশ, যার লক্ষ্য আমাদের দেশের নাগরিকদের মধ্যে অযৌক্তিক চিন্তাধারা গড়ে তোলা এবং ভুল তথ্য উপস্থাপন করা। এটি একটি সামাজিক মূলধারার বিরোধী কাজ এবং এর প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। আমরা সত্যিই আমাদের গৌরবময় অতীত নিয়ে গর্বিত। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার আমাদের আছে। তিনি বলেন, প্রাচীনকালে জাগতিক দর্শন ছিল ঐন্দ্রজালিক; গ্রহ এবং অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তু পৃথিবীতে শক্তিশালী বল প্রয়োগ করে বলে মনে করা হত। জন্মের সময় এই শক্তিগুলি আমাদের জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে বলে ধরে নেওয়া হত। বর্তমানে বিভিন্ন গ্রহ এবং বহু নক্ষত্রের দূরত্ব মাপা সম্ভব হয়েছে। তার থেকে আমরা জানি যে এই বস্তুগুলির প্রভাব আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করার পক্ষে নগণ্য। তিনি আরও বলেন বিজ্ঞান যুক্তিবাদী চিন্তাধারা মেনে চলে। বিজ্ঞানী হিসেবে আমাদের অবশ্যই ধৈর্য সহকারে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রচার করতে হবে এবং অযৌক্তিক চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। কিন্তু যখন অযৌক্তিক চিন্তাধারা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত হয়, তখন সংগ্রাম একটি ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, যেমনটি এখন আমাদের দেশে হয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক অনিকেত সুলে জ্যোতিষীদের ভবিষদ্বাণীর কোনও বৈধতা আছে কিনা, তা প্রমাণ করার জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি পুণে পরীক্ষা (নারলিকর, কুন্তে, দাভোলকর এবং ঘাটপান্ডে, ২০০৯), কার্লসন টেস্ট (বার্কলে, ১৯৯৭), ম্যাকগেরভে বিশ্লেষণ (জন ম্যাকগেরভে, ১৯৭৭), ম্যাকগ্রু এবং ম্যাকফাল (জন ম্যাকগ্রু এবং রিচার্ড ম্যাকফল, ১৯৯০), মনোজ কোমাথ দ্বারা সংকলিত এই বিষয়ে বিভিন্ন অতীত গবেষণার সারাংশ (কারেন্ট সায়েন্স, ২০০৯) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষাগুলি আলোচনা করেন। সর্বত্রই এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, এই ধরনের কোনও পরীক্ষায়, জ্যোতিষশাস্ত্রের কোনও পূর্বাভাস পরিসংখ্যানগত দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। তিনি বার্ট্রাম আর ফোরার-এর দ্বারা বর্ণিত ফোরার এফেক্ট (১৯৪৯) সমীক্ষা সম্পর্কেও আলোচনা করেন। এই সমীক্ষায় দেখা যায় যে এমন কিছু কিছু মন্তব্য আছে যা সকলেই মনে করে তার

জন্য প্রযোজ্য। জ্যোতিষীরা এইরকম মন্তব্যের নির্যাসকে তুলে ধরে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে বলে মানুষের ভক্তি উদ্রেক করে।

অধ্যাপক সুনীল মুখী প্রস্তাবের সমর্থনে আলোচনা করতে গিয়ে দেখান, মানসিক চাপযুক্ত লোকেরা মনে করে পৃথিবী একটি খুব কঠিন জায়গা এবং তারা অনেক কিছু বোঝে না। মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হল একটা সহজ উত্তর বেছে নেওয়া এবং তারপর সেটি আঁকড়ে থাকা। এটি এক ধরনের সাধারণ আচরণগত মনোবিজ্ঞান, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ইচ্ছা থেকে যার জন্ম। আপনার নিকটবর্তী জনসাধারণের বিশ্বাস থেকে আপনি কোনও নির্দিষ্ট ধরনের ভুল উত্তর পেয়ে যেতে পারেন এবং আপনিও তা অনুসরণ করে চলবেন। এটি একটি স্যামাজিকভাবে গড়ে ওঠা ইলিউশন বা প্রপঞ্চ। শিক্ষিত এবং নিরক্ষর, অভিজাত এবং দরিদ্র সকলেই বিভিন্ন কারণে ও সমাজে তার শ্রেণীগত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতিষশাস্ত্র, ছদ্মবিজ্ঞান এবং অনুরূপ বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করে।

এইসব মানুষ সত্যিকার অর্থেই ঐশ্বরিক আদেশে বিশ্বাস করতে চায় এবং এটাও বিশ্বাস করতে চায়, যে তার জীবনে যেসব ঘটনা ঘটছে তা পূর্বনির্ধারিত। এটি একটি মারাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। এর অর্থ হল আমি সংগ্রাম করতে পারব না এবং যা ঘটতে চলেছে তা নিবৃত্ত করতে পারব না, কারণ যে ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তা পরিবর্তন করা যায় না। এটি ব্যাপক সামাজিক অন্যায়কে সমর্থন করে। আপনি দরিদ্র কারণ আপনার পিতা-মাতা দরিদ্র; এবং কেউ ধনী কারণ তার পিতা-মাতা ধনী। তবুও এখনও মানুষ জ্যোতিষশাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে চলেছে।

যদি রাতের আকাশ দেখে শুধুমাত্র আপনি রাশিফলের কথা ভাবেন, তাহলে আপনি সেই আকাশ পরিদর্শনের সত্যিকারের উত্তেজনা অনুভব করবেন না। এমন কিছু বিষয়, এমনকি যার কোনও অস্তিত্ব নেই তা নিয়ে জ্যোতিষীরা একটি মিথ্যা উত্তেজনা তৈরি করেন। রাত্রির আকাশের অস্তিত্ব আছে, এটি আকর্ষণীয়, তবে এর কারণ এই নয় যে এর সাথে রাশিফল বা ভবিতব্যের কোনও সম্পর্ক আছে।

অধ্যাপক মুখী বলেন, মানুষের জ্ঞানজগতের সম্প্রসারণ এবং সামাজিক উপযোগিতা আনতে ভারতে আরও প্রকৃত বিজ্ঞানীর প্রয়োজন। আমরা সবাই এর সাথে একমত; সরকারও এর সাথে একমত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস এখন বিজ্ঞান হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে। একবার আপনি যদি এই বিষয়গুলি সত্য ভেবে পুলকিত হয়ে ওঠেন, তবে তা জাতির জন্য একটি বড় ক্ষতি। এই অর্থে, এই বিষয়গুলো খুবই জাতীয়তা বিরোধী।

এরপর প্রশ্ন-উত্তর পর্বে সকল বক্তা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রোতাদের দ্বারা উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেন। তাঁর সমাপনী বক্তব্যে ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় বলেন, এখন যা করা দরকার তা হল জ্যোতিষশাস্ত্রসহ এই সমস্ত অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ও এরূপ আরও কিছু বিষয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে সমাজে বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে ওঠে ও তা বিকশিত হতে পারে। আর সেইজন্য শিক্ষার সম্প্রসারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, মানুষকে সঠিক উপায়ে শিক্ষিত করা, সঠিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শেখানো, এগুলি অনুসরণ করে আমরা সমাজে বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে তোলার কাজ করতে পারি। এরপর কনভেনশনে উত্থাপিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং কনভেনশন শেষ হয়।

প্রতিবেদক : ড. রফিকুল উল আলম, সহ সভাপতি, ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি, কলকাতা।

উমা

‘শিল্প হবে দূষণ হবে না’—
এমন কথা কেউ কখনো কয়?
দূষণটাকে বাঁধো এমন করে
কোন প্রাণই বিপন্ন না হয়।
— প্রতুল মুখোপাধ্যায়

স ং গ ঠ ন   স ং বা দ

পাঠ্যক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অন্যান্য অবৈজ্ঞানিক ধারণার প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব

এই কনভেনশন শিক্ষাব্যবস্থার যে কোনো স্তরে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অন্যান্য অবৈজ্ঞানিক ধারণার প্রবর্তনের তীব্র নিন্দা জানায়। এটা আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, নতুন শিক্ষানীতিতে তথাকথিত 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম'-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং তার ফলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমিক পাঠ্যক্রমে নানা ধরনের ছদ্ম-বিজ্ঞান প্রবর্তনের কথা বিবেচনা করছে এবং ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে।

২০০১ সালে যখন ইউজিসি জ্যোতিষশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র এবং 'বৈদিক গণিত' ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ানোর বিষয় হিসেবে প্রস্তাব করেছিল, তখন অধ্যাপক জে ভি নারলিকার, অধ্যাপক পি এম ভার্গব এবং অধ্যাপক এস জি দানি, অধ্যাপক যশ পাল সহ অনেক বিজ্ঞানী একটি শক্তিশালী প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁরা সতর্কবাণী দিয়েছিলেন যে, এই ধরনের কোর্সগুলি শিক্ষার্থী এবং যুবকদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করবে, কারণ তারা প্রমাণ ছাড়াই কোনও ধারণা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

এই কনভেনশন অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'ভারতীয় শিক্ষা মণ্ডল'-এর সহযোগিতায় নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা সভা আয়োজন করার পরামর্শ দিচ্ছে, এবং এই ধরনের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রধানত হচ্ছে শিক্ষায়তনে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের নামে ছদ্ম-বিজ্ঞানের বিষয়গুলির প্রবর্তন ঘটানো। এই ধরনের ছদ্ম-বিজ্ঞানের বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তোলার জন্য আই আই টি খড়গপুরে 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমস্' স্থাপন করা হয়েছে।

জ্ঞানের জগতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, ধাতুবিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের সত্যিকারের অবদানের স্বীকৃতি এই কনভেনশন দেয়, কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিতে উদ্ভূত বিষয়গুলি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার সুযোগ হ্রাস করার প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করে। এটা আনন্দের যে শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানীরা বড় সংখ্যায় এই সংক্রান্ত একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। এই কনভেনশন বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষদের স্কুল ও কলেজের পাঠ্যক্রমে অবৈজ্ঞানিক উপাদান প্রবর্তনের পদক্ষেপকে ব্যর্থ করার জন্য একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

কনভেনশনের পক্ষে ব্রেকথ্রু সায়েন্স, কলকাতা

শ্রাদ্ধ নয় --- স্মরণসভা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

গত ২৮.৮.২০২১ তারিখে কাঁচরাপাড়া নিবাসী রণধীর চৌধুরি মহাশয় প্রয়াত হন। তাঁর পুত্র ইন্দ্রানুজ চৌধুরি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির হালিসহর শাখার সদস্য— কোনো পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন নি। এই উপলক্ষে গত ১৯.৯.২০২১ রবিবার একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় তাঁর বাড়িতে কাঁচরাপাড়া আর পি স্কুলের কাছে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস ভট্টাচার্য, এপিডিআর কর্মী বিদ্যুৎ ভৌমিক, হালিসহর শাখার সভাপতি সুশীল ঠাকুর এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা স্বপন শীল মহাশয়। প্রায় শতাধিক মানুষের সমাগম হয়। অসাধারণ বক্তব্য রাখেন বিদ্যুৎ ভৌমিক। তিনি গীতা থেকে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝান যে পারলৌকিক ক্রিয়া, আত্মা, মুখাগ্নি এইসব অর্থহীন। দেবাশিসবাবু তাঁর বক্তব্যে এসব স্মরণসভার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেন। সুশীল ঠাকুর নিজেও মাতৃশ্রাদ্ধ না করার অভিজ্ঞতার কথা বলেন। শেষ বক্তা ছিলেন সমিতির দপ্তর সম্পাদক দেবকুমার হালদার। তিনি পরিসংখ্যান সহ মরণোত্তর দেহদান, দেহাংশ দান ও চক্ষুদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। অত্যন্ত সাড়া ফেলে এই অনুষ্ঠানটি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হালিসহর শাখার সম্পাদক প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নদিয়ার বড়জাগুলিতে 'দ্বারকানাথ কোটনিস কমিটি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বি-শতবর্ষ উদযাপন কমিটি'-র যৌথ উদ্যোগে দিনটি পালন করা হয়। ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত ঐ অনুষ্ঠানে এলাকার যুবক থেকে প্রৌঢ় অনেকেই বিদ্যাসাগরের জীবনের নানান দিক তুলে ধরেন। বড়জাগুলির কাছেই নারায়নপুর গ্রামে বিদ্যাসাগরের দ্বি-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ঐ দিন স্থানীয় যুবকদের উদ্যোগে একটি গ্রন্থাগার চালু করা হয়। — **নিরঞ্জন বিশ্বাস**

উমা